দ্বিতীয় অধ্যায়

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাট্যকর্মের পরিচয়, পর্ব বিভাগ এবং পাশ্চাত্যের বাস্তব বিরোধী দর্শন-সাহিত্য-নাট্যতত্ত্ব ও আন্দোলনের পরিচয়

মোহিত চট্টোপাধ্যায় তখন নিয়মিত কবিতা লিখতেন। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'কবিতা সাপ্তাহিকী' এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় নিয়মিত তাঁর কবিতা বেরোত। ইতিমধ্যে তিনি জঙ্গিপুর কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগদান করেছিলেন। ছুটিছাটা পেলেই তিনি কলকাতায় চলে আসতেন। শ্যামবাজার কফি হাউস, কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, তুষার রায়, শান্তি লাহিড়ী, যোগেন চৌধুরী, বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, নিতাই ঘোষ, অসীম চক্রবর্তী, মনোজ মিত্র, দীপেন মুখোপাধ্যায়, শ্যামল ঘোষ প্রভৃতি কবি, কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার ও নির্দেশকদের সঙ্গে কবিতা, গল্প, আড্ডায় সময় কাটাতেন তিনি। নাটক নিয়ে প্রচুর পড়াশোনা করলেও নাটকের প্রতি প্রথমে তাঁর খুব বেশি আকর্ষণ ছিল না, এমনকি নাটক দেখতেও তিনি ততটা উৎসাহী ছিলেন না। তার বন্ধু তালিকাতেও ছিল কবি সাহিত্যিকরাই বেশি, একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন নাট্যনির্দেশক শ্যামল ঘোষ। সেই সময় শ্যামল ঘোষ ছিলেন 'গন্ধর্ব' নামে গ্রুপ থিয়েটার তথা নাট্যদলের নির্দেশক। তাঁর সঙ্গে সম্পর্কসূত্রেই মোহিত চট্টোপাধ্যায় প্রথম একটি ইংরেজি কাব্যনাটক অনুসৃজন করেন। ক্লেমেন্স ডেন বিরচিত 'উইল শেক্সপিয়র অ্যান ইনভেনশান' নামের নাটকটি তিনি 'উইল শেক্সপিয়র একটি কল্পনা' নামে অনুবাদ করেন।

নাটকটি শেক্সপিয়রের তরুণ জীবনের স্বপ্ন ও বাস্তব নিয়ে লেখা। তরুণ বয়সে শেক্সপিয়র নাট্যকার হওয়ার স্বপ্নে বিভোর ছিলেন। লণ্ডনে গিয়ে তিনি নাটক লিখে বিখ্যাত হতে চেয়েছিলেন। রানি এলিজাবেথের সামনে নাটক অভিনয় করে তার প্রশংসা পেতে চেয়েছিলেন শেক্সপিয়র।

শ্যামল ঘোষ নাটকটি সম্পর্কে বলেছেন— ''এমনি সব অসম্ভবের স্বপ্ন দেখা এক পাগলের সঙ্গে আদ্যন্ত সংসার ভালোবাসা তাঁর স্ত্রী অ্যানি হ্যাথাওয়ের কথোপকথন নিয়ে দৃশ্যটি নির্মিত। পাড়াগাঁয়ের মানুষ অ্যানি ওই অচেনা দূর দেশে স্বামীকে ছাড়তে ভয় পায়। আশঙ্কা, ওখানে গেলে তার স্বামী আর ফিরে আসবে না। রাজধানী গিলে ফেলবে তাকে। কিন্তু সংসার বাঁচাতে গিয়ে, শুধুমাত্র নিরাপত্তার কারণেই এমন অসম্ভবের স্বপ্ন দেখা অকল্পপ্রতিভা ছন্নছাড়া হয়ে যাবে? এমনি এক টানাপোড়েন নিয়ে ছোট্ট প্রস্তাবনা দৃশ্যটি শুনতে শুনতে কয়েক শতাব্দী পেছনে চলে যেতে লাগলাম। ভাবি কী আশ্চর্য ভাষান্তর? গদ্যে লেখা যদিও তবু তার প্রতিটি শব্দ যেন কবিতার স্তবকে মোড়া।''[১]

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই নাটকটি প্রযোজনা করা সম্ভব হয়নি। গন্ধর্ব নাট্যদলের একটি ত্রৈমাসিক নাট্যপত্র ছিল। সেই নাট্যপত্রে মোহিত চট্টেপাধ্যায়ের দ্বিতীয় নাটক, কিন্তু প্রথম মৌলিক ও পূর্ণাঙ্গ নাটক 'কণ্ঠনালীতে সূর্য' (১৯৬৩) প্রকাশিত হয়। এই সময় কবি হিসেবে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের পরিচিতি ছিল মধ্য গগনে। শ্যামল ঘোষ 'কণ্ঠনালীতে সূর্য' সম্পর্কে জানিয়েছেন,

''... কবির লেখা নাটক বলে বেশ আগ্রহ নিয়ে পড়লেন সবাই। মিশ্র প্রতিক্রিয়া হল পাঠক মহলে। কেউ বললেন, দারুণ— সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের। কারও মতে মন্দ নয়— আধুনিক কবিতার মতো। দুর্বোধ্য অথবা, পড়তে খারাপ লাগে না, তবে বড় অবাস্তব। ইত্যাদি এবং ইত্যাদি।''[২]

একজন কবি হিসেবে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটক লেখা প্রসঙ্গে শ্যামল ঘোষের অভিমত হল—

''নাটকও তো এক ধরনের কবিতাই। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে তাকে তো দৃশ্যকাব্যই বলা হয়েছে। তাই কবিদের পক্ষে নাটক রচনা স্বাভাবিক। কবির কল্পনাশক্তিই বদলে দিতে পারে প্রচলিত নাট্যের প্রথাগত চরিত্র। তাই হয়ত মহাকবি কালিদাস থেকে শেক্সপিয়র রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত মহাকবিদের নাট্যকাব্য প্রথাভঙ্গে দর্পিত বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। কণ্ঠনালীতে সূর্য-র চলন দেখে মনে হয় নিয়মিত নাটক লিখলে কবি মোহিতও হয়ত একদিন বাংলা নাটকে একটি স্থায়ী বদল আনতে সক্ষম হবেন।''[৩]

সত্যি সত্যি বাংলা নাটকে যারা বদল আনতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে মোহিত চট্টোপাধ্যায় অন্যতম একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। এরপর থেকে তিনি কবিতার জগৎ থেকে সম্পূর্ণ রূপে বাংলা নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। 'নীল রঙের ঘোড়া', 'মৃত্যুসংবাদ', 'গন্ধরাজের হাততালি', 'চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড', 'দ্বীপের রাজা', 'সিংহাসনের ক্ষয়রোগ', 'নিষাদ', 'বাঘবন্দী', 'ক্যাপ্টেন হুররা', 'রাজরক্ত' প্রভৃতি প্রচলিত ধারা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যতিক্রমী বাংলা নাটক লিখে বাংলা থিয়েটারে এক নতুন ঘরানার জন্ম দেন তিনি। সমগ্র জীবনে তিনি প্রায় একশোরও বেশি নাটক লিখেছেন। তাঁর নাটকগুলি কলকাতা ও জেলার অসংখ্য ছোট, মাঝারি, বড় মাপের নাট্যদল মঞ্চস্থ করে, যেমন— গন্ধর্ব, CPAT, চতুর্মুখ, নক্ষত্র, লোকায়ন, নান্দীকার, প্লেমেকার্স, বহুরূপী, থিয়েটার ওয়ার্কশপ, LTG, থিয়েটার কমিউন, সমীক্ষণ, শূদ্রক, কলকাতা নাট্যকেন্দ্র, নান্দীমুখ, শৈল্পিক, সংস্তব, গান্ধার, অন্য থিয়েটার, গ্রুপ থিয়েটার, নাট্যাঙ্গন, ঝংকার, সমকালীন শিল্পীদল, কথাকৃতি, শোহন, রঙ্গপট, রঙরূপ, চেতনা, মাঙ্গলিক প্রভৃতি। তাঁর নাটকের বিশিষ্ট নির্দেশকেরা ছিলেন শ্যামল ঘোষ, অসিত বসু, অসীম চক্রবর্তী, মনোজ মিত্র, অরুণ রায়, সুরজিৎ ঘোষ, বিভাস চক্রবর্তী, রাম মুখোপাধ্যায়, ফ্রিৎজ বেনেভিৎজ, পঙ্কজ মুন্সী, চিন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত মুখোপাধ্যায়, অম্বর রায়, সত্য ভাদুড়ী, দুলাল চক্রবর্তী, সমীর বিশ্বাস, সঞ্জীব রায়, অশোক চট্টোপাধ্যায়, অনীশ ঘোষ, ডলি বসু, দীপক দাস, সীমা মুখোপাধ্যায়, সংগ্রামজিৎ সেনগুপ্ত প্রমুখ।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের সমগ্র রচনা গ্রন্থাকারে এখনো প্রকাশিত হয়নি। কিছু নাটক এককভাবে এবং বিভিন্ন নাটকের সমাহারে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর বেশিরভাগ নাটকই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ লাভ করেছিল। সেগুলি এখনো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। তাঁর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত নাটকগুলি হল—

১. মৃত্যুসংবাদ : নক্ষত্র প্রকাশনা থেকে ১৯৬৪ সালে নাট্যগ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়।

২. রাজরক্ত: ১৯৯২ সালে নাট্যগ্রন্থ রূপে প্রকাশিত হয়।

৩. ক্যাপ্টেন হুররা : ১৯৮১ সালে নাট্যগ্রন্থ রূপে প্রকাশিত হয়।

৪. একাঙ্ক নাট্য সংগ্রহ : ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮ সালে নাট্যগ্রন্থ রূপে প্রকাশিত হয়— রিঙ, বাজপাখি, সোনার চাবি, ফিনিক্স, মাছি, বাইরের দরজা, লাঠি, ভূত, বর্ণপরিচয়, সুন্দর।

৫. পূর্ণাঙ্গ নাট্য সংগ্রহ: ১ জানুয়ারি ১৯৯১ তে নাট্যগ্রন্থ রূপে প্রকাশিত। একাল সেকাল প্রকাশনী থেকে। এখানে যে নাটকগুলি স্থান পেয়েছে সেগুলি হল— মৃত্যুসংবাদ, রাজরক্ত, কণ্ঠনালীতে সূর্য, স্বদেশী নক্‌শা, নিষাদ।

৬. নাট্যসংকলন: ২২ নভেম্বর, ১৯৯০ সালে নাট্যগ্রন্থে প্রকাশিত। প্রকাশনা সমীক্ষণ। এই সংকলনের নাটকগুলি হল— স্বদেশী নক্‌শা, কানামাছি খেলা, তোতারাম, মৃচ্ছকটিক।

৭. গালিলেওর জীবন: প্যাপিরাস প্রকাশনা থেকে ১৯৯১ সালে নাট্যগ্রন্থ রূপে প্রকাশিত।

৮. নাটকসমগ্র-১: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স থেকে ২০০১-এ প্রকাশিত। এই গ্রন্থে প্রকাশিত নাটকগুলি হল— কণ্ঠনালীতে সূর্য, নীল রঙের ঘোড়া, মৃত্যুসংবাদ, গন্ধরাজের হাততালি, চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড, দ্বীপের রাজা, সিংহাসনের ক্ষয়রোগ, নিষাদ, বাঘবন্দী, ক্যাপ্টেন হুর্‌রা, রাজরক্ত, রিঙ, বাজপাখি, মাছি, ফিনিক্স, সোনার চাবি।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের সমগ্র নাটকগুলিকে প্রকরণগত দিক থেকে নানা ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন— ক. পূর্ণাঙ্গ নাটক খ. কাব্যনাটক গ. একাঙ্ক নাটক ঘ. স্বল্প দৈর্ঘ্যের নাটক বা ছোট নাটক ঙ. অণুনাটক। এদের মধ্যে আবার কিছু নাটক অনুবাদ বা অনুসৃজন রয়েছে। এছাড়া তিনি প্রচুর নাটক সম্পাদনা ও পুনর্লিখনের কাজও করেছিলেন।

ক. পূর্ণাঙ্গ নাটক:

১. কণ্ঠনালীতে সূর্য ২. উইল শেক্‌সপীয়র ৩. নীলরঙের ঘোড়া ৪. গন্ধরাজের হাততালি ৫. মৃত্যুসংবাদ ৬. চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড ৭. সিংহাসনের ক্ষয়রোগ ৮. দ্বীপের রাজা ৯. নিষাদ ১০. বাঘবন্দী ১১. ক্যাপ্টেন হুররা ১২. রাজরক্ত ১৩. স্বদেশী নক্‌শা ১৪. আলিবাবা ১৫. মৃচ্ছকটিক ১৬. মহাকালীর বাচ্চা ১৭. নোনাজল ১৮. কানামাছি খেলা ১৯. তোতারাম ২০. সোক্রাতেস ২১. পুষ্পক রথ ২২. সুন্দর ২৩. তখন বিকেল ২৪. শমীবৃক্ষ ২৫. ঢিসুম ঢিসুম ২৬. গুহাচিত্র ২৭. গজানন চরিত মানস ২৮. জন্মদিন ২৯. বিপন্ন বিস্ময় ৩০. সিদ্ধিদাতা ৩১. হারুন অল রসিদ ৩২. দর্পণ ৩৩. জাম্বো ৩৪. মিস্টার রাইট ৩৫. ঘুম ৩৬. জুতো ৩৭. বঙ্কুবাবু এলেন ৩৮. আওরঙ্গজেব।

খ. কাব্যনাটক :

১. পদশব্দ ২. মহারাজ ৩. দুঃস্বপ্ন ৪. রঙিন কাচ।

গ. একাঙ্ক নাটক :

১. রিঙ, ২. বাজপাখি ৩. সোনার চাবি ৪. ফিনিক্স, ৫. মাছি ৬. বাইরের দরজা ৭. লাঠি ৮. ভূত ৯. বর্ণপরিচয় ১০. রাক্ষস ১১. সুন্দর, ১২. ভালোমন্দ ১৩. উড়োমেঘ, ১৪. ভাইরাস ১৬. সমান্তরাল,

১৭. আয়ুদান ১৮. খরস্রোত ১৯. উরুভঙ্গ ২০. বিধাতাপুরুষ ২১. রাক্ষস ২২. যীশু ২৩. তৃতীয় নয়ন ২৪. যশোমতী ২৫. সেলফোন ২৬. রিঙ ২৭. অক্টোপাস লিমিটেড ২৮. সুন্দর ২৯. জাম্বো ৩০. মায়ের মতো।

ঘ. স্বল্প দৈর্ঘ্যের নাটক: ১. আত্মকথা ২. কৌটো

ঙ. অণুনাটক : ১. একটি মাথা দুটি ছাতা ২. কালোব্যাগ ৩. ইন্টারভিউ ৪. ষোলো পাতা ৫. মুখ ৬. পোকামাকড়ের কুটুম ৭. কাঁথা।

অনুসৃজন:

১. উইল্ শেক্সপিয়র ২. কাল বা পরশু ৩. গালিলেওর জীবন ৪. তখন বিকেল ৫. তুষাগ্নি ৬. বৃত্ত ৭. ভেনিসের বণিক ৮. মেটামরফোসিস ৯. লাইসিসট্রাটা (অসম্পূর্ণ)।

সম্পাদনা ও পুনর্লিখন:

১. আওরঙ্গজেব (পুনর্লিখন সম্পাদনা) ২. আলিবাবা (পুনর্লিখন) ৩. গণশত্রু (সম্পাদনা ও পুনর্লিখন) ৪. তুষের আগুন (পুনর্লিখন) ৫. পুনর্জন্ম (সম্পাদনা ও পুনর্লিখন) ৬. মার্নময়ী গার্লস স্কুল (সম্পাদনা) ৭. মিসেস সোরিয়ানো (সম্পাদনা) ৮. মুক্তিদীক্ষা (সম্পাদনা) ৯. মৃচ্ছকটিক (সম্পাদনা) ১০. মেঘ (সম্পাদনা) ১১. লোভেন্দ্র গবেন্দ্র (সম্পাদনা) ১২. শেক্সপিয়র (অনুবাদ, পুনর্লিখন) ১৩. শেষ রক্ষা (সম্পাদনা)।

১৯৬৩ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকের কালানুক্রমিক বিবরণ—

১. কণ্ঠনালীতে সূর্য : 'গন্ধর্ব' নাট্যপত্রে শারদ সংখ্যায় ১৯৬৩ সালে এই নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয়। মোহিত চট্টোপাধ্যায়, নাটক সমগ্র, প্রথম খণ্ডে মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স থেকে ২০০১ সালে পুনর্মুদ্রিত।

২. উইল শেক্সপিয়র : ক্লিমেন্স ডেন-এর 'উইল শেক্সপিয়র অ্যান ইনভেনশন' অবলম্বনে কাব্যনাটকটি অনুবাদ করেন ১৯৬৪ সালে।

৩. নীল রঙের ঘোড়া: ডি.এইচ লরেন্সের The Rocking Horse winner' (1926) ছোটগল্প অবলম্বনে ভাবানুবাদ করেন ১৯৬৪ সালে। গন্ধর্ব নাট্যপত্রে শারদসংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। ২০০১ সালের সেপ্টেম্বরে মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স থেকে মোহিত চট্টোপাধ্যায় নাটক সমগ্র প্রথম খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত।

৪. মৃত্যুসংবাদ : J.M Synge-এর The Playboy of the Western World' (1970) অবলম্বনে অনুসৃজন করেন ১৯৬৫ সালে। ২০০১ সালে সেপ্টেম্বরে মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স থেকে মোহিত চট্টোপাধ্যায় 'নাটক সমগ্র' প্রথম খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত।

৫. বাইরের দরজা : ১৯৬৫ সালে 'গন্ধর্ব' পত্রিকার শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ২০১০ সালে জানুয়ারিতে 'নাট্যচিন্তা' থেকে 'মোহিত চট্টোপাধ্যায় নির্বাচিত নাটক সংগ্রহে' পুনর্মুদ্রিত।

৬. মেটামরফসিস: Franz kafka-র 'Metamorphosis' (1915) গল্পের নাট্যরূপ। 'কণ্ঠনালীতে

সূর্য' ও 'মেটামরফসিস' নাটক দুটি একত্রে ১৯৬৫ সালে 'বীক্ষণ' প্রকাশনী থেকে মৃণাল দেব কর্তৃক মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম নাট্যগ্রন্থ রূপে প্রকাশিত।

৭. রিং: ১৯৬৫ সালে 'ক্ষপণক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ২০১০ সালের জানুয়ারিতে 'মোহিত চট্টোপাধ্যায় নির্বাচিত নাটক সংগ্রহ' নামে নাট্যচিন্তা থেকে প্রকাশিত গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত।

৮. চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড : ফরাসী ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার জিরাদ্যুর (Giraudoux) মূল নাটক ফরাসী ভাষায় 'Intermezzo' নাটকটি অ্যাডাপ্ট করেন মরিস ভ্যালেন্সি (Maurice Valency) 'The Enchanted' নাম দিয়ে। এই নাটকটিই মোহিত চট্টোপাধ্যায় অনুসৃজন করেন 'চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড' নামে। প্রথম প্রকাশ হয় 'বহুরূপী'-২৫ এ ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসে। ২০০১-এসেপ্টেম্বরে মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স থেকে 'মোহিত চট্টোপাধ্যায় নাটক সমগ্র প্রথম খণ্ডে' পুনর্মুদ্রিত।

৯. সোনার চাবি: ১৯৬৬ সালে রচিত হয়। ১৯৭৩ সালে 'অভিনয়' পত্রিকায় শারদ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। ২০০১-এর সেপ্টেম্বর মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স থেকে 'মোহিত চট্টোপাধ্যায় নাটক সংগ্রহ প্রথম খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত।

১০. গন্ধরাজের হাততালি : প্রথম প্রকাশ ১৯৬৬ সালে গন্ধর্ব শারদ সংখ্যায় মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্সে প্রকাশিত (২০০১) 'মোহিত চট্টোপাধ্যায় নাটক সমগ্র' প্রথম খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত।

১১. দ্বীপের রাজা: এই নাটকটি ১৯৬৬ সালে রচিত হয়। ১৯৬৮ সালে থিয়েটার নাট্যপত্রিকায় শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স থেকে মোহিত চট্টোপাধ্যায় নাটক সমগ্র প্রথম খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত।

১২. সিংহাসনের ক্ষয়রোগ: এই নাটকটি ১৯৬৭ সালে রচিত। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স থেকে 'মোহিত চট্টোপাধ্যায় নাটকসমগ্র' প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত।

১৩. নিষাদ: ১৯৬৮ সালে রচিত। ১৯৬৮ সালে 'অভিনয় দর্পণ' পত্রিকায় (১, ৩) আগস্ট-সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স থেকে মোহিত চট্টোপাধ্যায় নাটক সমগ্র প্রথম খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত (২০০১ সেপ্টেম্বর)।

১৪. বৃত্ত : 'Eugene O' Neill-এর Where the cross is made' অবলম্বনে 'বৃত্ত' নামে অনুসৃজন করেন তিনি। রচনা হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে কিনা জানা যায় না।

১৫. বাজপাখি: 'অভিনয় দর্পণ' পত্রিকা বর্ষ ১ সংখ্যা ৬ মার্চ-এপ্রিলে প্রথম প্রকাশিত। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স থেকে 'মোহিত চট্টোপাধ্যায় নাটক সমগ্র' প্রথম খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত (২০০১, সেপ্টেম্বর)।

১৬. পুষ্পক রথ: অভিনয় দর্পণ পত্রিকা বর্ষ-২, সংখ্যা ২ জুলাই-আগস্টে প্রথম প্রকাশিত।

১৭. বাঘবন্দী : 'অভিনয় দর্পণ' পত্রিকায় শারদ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স থেকে 'মোহিত চট্টোপাধ্যায় নাটক সমগ্র' প্রথম খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত (২০০১, সেপ্টেম্বর)।

১৮. ক্যাপ্টেন হুর্‌রা: অভিনয় নাট্যপত্রে ১৯৭০ সালে সেপ্টেম্বরে প্রথম প্রকাশিত। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স থেকে 'মোহিত চট্টোপাধ্যায় নাটক সমগ্র' প্রথম খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত (২০০১, সেপ্টেম্বর)।

১৯. রাজরক্ত: ১৯৭০ সালে রচিত হয়। প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালে। নাট্যব্যক্তিত্ব অশোক মুখোপাধ্যায়ের পরামর্শে মূল নাটকের 'গিনিপিগ' নামটি 'রাজরক্ত' রাখা হয়। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স থেকে 'মোহিত চট্টোপাধ্যায় নাটক সমগ্র' প্রথম খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত।

২০. কাব্যনাটক : কাব্যনাটকগুলোর প্রথম প্রকাশের নির্দিষ্ট কোন কাল জানা যায় না। নাট্যব্যক্তিত্ব কমল সাহার 'হৃদয়ের থেকে ভালো বাসভূমি নেই' গ্রন্থ থেকে জানা যায় তাঁর সমস্ত কাব্যনাটকগুলো ১৯৭২ সালের আগে রচিত। 'পদশব্দ', 'মহারাজ' ও 'দুঃস্বপ্ন' এই তিনটি কাব্যনাটক মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'ভালোবাসা ভালোবাসা' কাব্যগ্রন্থে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৩ সালে তাঁর 'কবিতা সংগ্রহে' পুনঃমুদ্রিত হয়। 'রঙিন কাচ'-এর প্রকাশও ১৯৭২-এর আগে। প্রথম প্রকাশ গন্ধর্বে, দ্বিতীয় প্রকাশ 'ভালোবাসা ভালোবাসা' নামক কাব্যগ্রন্থে।

২১. আলিবাবা: মোহিত চট্টোপাধ্যায় এই নাটকটির পুনর্লিখন করেন। মূলনাটক ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। ১৯৭৩ সালে শূদ্রক নাট্যপত্রে (সংখ্যা ৪)-এ প্রকাশিত হয়।

২২. স্বদেশী নক্সা : এই নাটকটি কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা', প্রমথ চৌধুরীর 'রাম ও শ্যাম' গল্প এবং সুপ্রকাশ রায়ের 'ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম' অবলম্বনে রচিত।"[৪] নাটকটির রচনাকাল ১৯৭৪। ১৯৮৫ স্ত্রী: গ্রুপ থিয়েটার (২৬ বর্ষ ৭ সংখ্যা ২) পত্রিকায় প্রকাশিত।

২৩. মৃচ্ছকটিক: মূল নাটক সংস্কৃত ভাষায় শূদ্রকের লেখা। ১৯৭৫ সালে পুনর্লিখন করেন তিনি। সমীক্ষণ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত হয়।

২৪. লাঠি: মূল গল্প মুনশি প্রেমচাঁদ -এর। নাট্যরূপ দিয়েছেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। থিয়েটার বুলেটিন পত্রিকায় ১৯৭৭ সালে প্রথম প্রকাশিত। 'মোহিত চট্টোপাধ্যায় দশ রূপক' নামে কলাভৃৎ থেকে প্রকাশিত গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত, জানুয়ারি ২০০৯ এ।

২৫. মহাকালীর বাচ্চা: থিয়েটার বুলেটিন পত্রিকায় আগস্ট-অক্টোবর সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। পুনর্মুদ্রিত হয় অক্টোবর ১৯৭৯ তে গ্রুপ থিয়েটারে-৫বর্ষ, ২ সংখ্যা।

২৬. মাছি : থিয়েটার বুলেটিন পত্রিকায় ১৯৭৮-এ প্রথম প্রকাশিত হয়। কলাভৃৎ থেকে প্রকাশিত 'মোহিত চট্টোপাধ্যায় দশ রূপক গ্রন্থে' পুনর্মুদ্রিত। জানুয়ারি ২০০৯।

২৭. গালিলেওর জীবন : Bertolt Brecht-এর life of Galilio (1937-39)-এর অনুবাদ করেন ১৯৮০ সালে। ১৯৮১ তে থিয়েটার বুলেটিন পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। প্যাপিরাস প্রকাশনী থেকে গ্রন্থরূপে প্রকাশ লাভ করে ১৯৯১ সালে।

২৮. কানামাছি খেলা : ১৯৮৪ সালে অক্টোবর মাসে গন্ধর্ব (৩-৪)-এ শারদীয় সংকলন এ প্রকাশিত হয়। পরে ১৯৯০ সালে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'নাট্যসংকলন' সমীক্ষণ থেকে পুনর্মুদ্রিত।

২৯. বর্ণ পরিচয় : ১৯৮৩ সালে রচিত। জানুয়ারি ২০০৯ সালে 'দশ রূপক' নামক গ্রন্থে প্রকাশিত।

৩০. ভূত : ১৯৮৪ সালে গ্রুপ থিয়েটার পত্রিকায় (২২ বর্ষ ও সংখ্যা ২) প্রকাশিত। ইণ্ডিয়ান বুক

মার্ট থেকে 'একাঙ্ক নাট্য সংগ্রহ' ও 'কলাভৃৎ' থেকে 'দশ রূপক' গ্রন্থে জানুয়ারি ২০০৯ সালে পুনর্মুদ্রিত।

৩১. তোতারাম : ১৯৮৬ সালে রচিত। ১৯৮৭ খ্রী: সেপ্টেম্বরে গন্ধর্বে (৩৮) শারদ সংকলনে প্রকাশিত। ১৯৯০-এ 'সমীক্ষণ' থেকে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'নাট্যসংকলন' নামে গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত।

৩২. সোক্রাতেস: নাট্য আকাদেমি পত্রিকা দ্বিতীয় সংখ্যা ১৯৯২-এ জানুয়ারিতে প্রকাশিত।

৩৩. সুন্দর: ১৯৯৮ সালের ১৮ই নভেম্বর দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত। 'একাঙ্ক নাট্যসংকলন' নামে পুস্তক বিপণি থেকে প্রকাশিত। 'কলাভৃৎ' প্রকাশনী থেকে 'দশরূপক'-এ পুনর্মুদ্রিত।

৩৪. তখন বিকেল : Arbuzov-এর 'Old World' নাটকের অনুসৃজন করেন ১৯৯২ সালে। রঙ্গপট ২, ২০০৫-এর অক্টোবরে প্রকাশিত।

৩৫. নোনাজল : ১৯৯২ সালে রচিত। শারদীয় আজকাল ১৪১৬ সালে প্রকাশিত।

৩৬. লোভেন্দ্র গবেন্দ্র : মূলনাটক রাজকৃষ্ণ রায়। অনুসৃজন করেন ১৯৯২ সালে। প্রকাশ হয়েছে কিনা জানা যায়নি।

৩৭. ঢিসুম ঢিসুম। মুষ্ঠিযোগ : ১৯৯৩ সালে রচিত। গন্ধর্ব পত্রিকায় শারদীয় সংকলনে 'ঢিসুম ঢিসুম' নামে প্রকাশিত। 'কলাভৃৎ' প্রকাশনী থেকে 'দশকথা' নামক গ্রন্থে ২০০৯ সালে পুনর্মুদ্রিত।

৩৮. জোছনাকুমারী : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের এই নামের উপন্যাস অবলম্বনে ১৯৯৩ সালে অনুসৃজন করেন।

৩৯. গুহাচিত্র: ১৯৯৩ সালে স্যাস (১০) নাট্যপ্রত্রিকায় প্রকাশিত।

৪০. গজানন চরিত মানস: ১৯৯৪ সালে রচিত। দুই বাংলার থিয়েটার পত্রিকায় ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত।

৪১. জন্মদিন : ১৯৯৭ সালে রচিত। ১৯৯৯-এ গ্রুপ থিয়েটার পত্রিকায় প্রকাশিত।

৪২. অক্টোপাস লিটিটেড: ১৯৯৭ সালে স্যাস (১৪) নাট্যপ্রত্রিকায় প্রকাশিত। ২০০১ সালে কুমার রায়ের সম্পাদনায় বাংলা একাঙ্ক নাট্য সংকলনে পুনর্মুদ্রিত।

৪৩. কাল বা পুরশু : Max Frisch-এর 'The Fire Raiser' (১৯৫৩-৫৮)-এর অনুসৃজন। ১৯৯৭ সালে স্যাস (১৪) নাট্যপত্রিকায় প্রকাশিত। ২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন থেকে 'মোহিত চট্টোপাধ্যায় নাট্যসংগ্রহে' পুনর্মুদ্রিত।

৪৪. বিপন্ন বিস্ময়: ১৯৯৮ সালে শারদীয় আজকাল-এ প্রকাশিত।

৪৫. সিদ্ধিদাতা: ১৯৯৯ সালে স্যাস (১৬)-এ প্রকাশিত। ২০০৯-এর জানুয়ারি কলাভৃৎ প্রকাশনী থেকে 'দশকথা' সংকলনে পুনর্মুদ্রিত।

৪৬. হারুন অল রসিদ: শারদীয় প্রতিদিন-এ ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত।

৪৭. দর্পণ: ১৯৯৯ সালে রচিত। তথ্যকেন্দ্র পত্রিকা ২০০১-০২ এ প্রকাশিত।

৪৮. তুষাগ্নি: ২০০০ সালে Slowamir Mrozek-এর মূল রচনা Policja অবলম্বনে 'The Police' -এর অনুসৃজন করেন 'তুষাগ্নি' নামে। (পরে তুষের আগুন নাম হয়) 'স্যাস' নাট্যপত্রিকায়

প্রকাশিত হয়।

৪৯. জাম্বো: ঘরে বাইরে নাট্যপত্র (১) ২০০১ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত। ২০০৯ সালে কলাভৃৎ থেকে মোহিত চট্টোপাধ্যায় দশকথা সংকলনে পুনর্মুদ্রিত।

৫০. মিস্টার রাইট : স্যাস (১৮) নাট্যপত্রে ২০০১ সালে প্রকাশিত।

৫১. ঘুম : বহুরূপী (১০০), ২০০৩ সালে সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত।

৫২. জুতো : স্যাস ২০, ২০০৩ সালে প্রকাশিত। নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন থেকে ২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে মোহিত চট্টোপাধ্যায় নির্বাচিত নাট্যসংগ্রহে পুনর্মুদ্রিত।

৫৩. মার্নময়ী গার্লস স্কুল : রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের এই নামের নাটকটি অনুসৃজন করেন মোহিত চট্টোপাধ্যায় ২০০৪ সালে।

৫৪. কালের যাত্রা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকের অনুসৃজন করেন ২০০৩ সালে।

৫৫. মিসেস সোরিয়ানো: এডুয়ার্ডো ডি ফিলিপের Filumena Arturano অবলম্বনে অনুবাদ করেন ২০০৪ সালে।

৫৬. কালো ব্যাগ: ২০০৪ সালে থিয়েটার রঙ্গ নাট্যপত্রে প্রথম প্রকাশিত। রঙ্গপট চতুর্থ সংখ্যা ২০০৯-এ পুনর্মুদ্রিত। নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন থেকে ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাসে 'মোহিত চট্টোপাধ্যায় অণুনাটক সংগ্রহে' পুনর্মুদ্রিত।

৫৭. তুষের আগুন: 'তুষাগ্নি'র পুনর্লিখন ২০০৪ সালের 'রঙ্গপট'-এ প্রকাশিত।

৫৮. ভালোমন্দ: ২০০৪ সালে স্যাস (২১)-এ প্রকাশিত।

৫৯. ভেনিসের বণিক : অনুষ্টুপ ৩৮, ২০০৪ সালে শেক্সপিয়র-এর The Marchant of Venice-এর অনুবাদ।

৬০. শেষরক্ষা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকের ২০০৪ সালে অনুসৃজন করেন।

৬১. দাহ: স্যাস (২২), ২০০৫ সালে প্রকাশিত।

৬২. পুনর্জন্ম : এই নামের দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসনের অনুসৃজন।

৬৩. গণশত্রু : ২০০৫ সালে রচিত। ২০১২ সালে রঙ্গপট নাট্যপত্র ২০১২ সালে প্রকাশিত। Henric Ibsen-এর নাটক 'An Enemy of the People' (মূল নাম Folkefiende) -এর অরুণ মুখোপাধ্যায় কৃত নাট্যরূপ এবং সত্যজিৎ রায় কৃত চিত্রনাট্য অবলম্বনে।)'[৫]

৬৪. একটি ছাতা দুটি মাথা: নান্দীকারের ২২ তম জাতীয় নাট্যমেলার বুলেটিনে প্রথম প্রকাশ। রঙ্গপট (৪) ২০০৯-এ প্রকাশিত। নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন থেকে জানুয়ারি ২০১৬ সালে মোহিত চট্টোপাধ্যায় অণুনাটক সংগ্রহে পুনর্মুদ্রিত।

৬৫. উড়োমেঘ : ২০০৬ সালে রঙ্গপট (৩)-এ প্রকাশিত। ২০০৯-এর জানুয়ারিতে মোহিত চট্টোপাধ্যায় দশকথা সংকলনে পুনর্মুদ্রিত।

৬৬. ভাইরাস: ২০০৬ সালে গণনাট্য (৪২/৫)-এ প্রকাশিত। ২০০৯ সালের জানুয়ারিতে কলাভৃৎ

প্রকাশিত মোহিত চট্টোপাধ্যায় দশকথা নামের সংকলনে পুনর্মুদ্রিত।

৬৭. বঙ্কুবাবু এলেন: ২০০৬ সালে স্যাস (২৩) নাট্যপত্রিকায় প্রকাশিত।

৬৮. কৌটো: ২০০৯ সালে বহুরূপীতে প্রকাশিত। ২০০৯-এর জানুয়ারি মাসে কলাভৃৎ প্রকাশনী থেকে মোহিত চট্টোপাধ্যায় দশ রূপক নামে ছোট নাটকের সংকলনে পুনর্মুদ্রিত।

৬৯. মৌমাছি: ২০০৭-এ রঙ্গপট-এ প্রকাশিত। নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন থেকে মোহিত চট্টোপাধ্যায় অণুনাটক সংগ্রহে প্রকাশিত।

৭০. হীরামন: প্রথম প্রকাশ ২০০৯-এ স্যাস (২৪) নাট্য পত্রিকায়।

৭১. সমান্তরাল: 'সময় শারদ সংখ্যা ২০০৭ (Times of India-র বাংলা পত্রিকা)'[৬]

৭২. মল্লভূমি: ১৪১৪-এ আজকাল শারদসংখ্যায় প্রকাশিত।

৭৩. আওরঙ্গজেব : মূল নাটক ইন্দিরা পার্থসারথির তামিল নাটক। পুনর্লিখন মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের। কমল সাহা লিখেছেন,

'ইংরেজি থেকে বঙ্গানুবাদ সত্য ভাদুড়ি। প্রকাশ ২০০৬ স্যাস-২৩। নাটকের শেষে অনুবাদকের তথা পত্রিকা সম্পাদকের ঘোষণা : মূল নাট্যকার ইন্দিরা পার্থসারথি লিখিত অনুমতির ওপর ভিত্তি করে এই নাটকটি এখানে পত্রস্থ করা হল।' ভাষান্তরটি করার ক্ষেত্রে সবিশেষ সাহায্য নেওয়া হয়েছে কে.ভি. রামানাথনের ইংরেজি অনুবাদেরও। বঙ্গানুবাদের ক্ষেত্রে বিশেষ সাহায্য করেছেন নীলেশ দাশগুপ্ত।"[৭]

৭৪. আয়ুদান: ১৪১৫ সালে আজকাল শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত।

৭৫. খরস্রোত : ২০০৮-এ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে গণনাট্য পত্রিকায় প্রকাশিত। কলাভৃৎ প্রকাশনী থেকে ২০০৯ সালে জানুয়ারিতে মোহিত চট্টোপাধ্যায় 'দশকথা' ছোট নাটকের সংকলনে পুনর্মুদ্রিত।

৭৬. নাক: নিকোলাই গোগোল-এর ছোটগল্প 'The Nose' অবলম্বনে অনুসৃজন। ১৪১৬ সালে আজকাল শারদসংখ্যায় প্রকাশিত।

৭৭. উরুভঙ্গ : ২০০৯-এর জানুয়ারিতে কলাভৃৎ প্রকাশনী থেকে 'দশকথা' ছোট নাটকের সংকলনে প্রকাশিত।

৭৮. আত্মকথা : কলাভৃৎ প্রকাশনী থেকে জানুয়ারি ২০০৯-এ 'দশকথা' নামে ছোট নাটকের সংকলনে প্রকাশিত।

৭৯. বিধাতাপুরুষ : কলাভৃৎ প্রকাশনী থেকে জানুয়ারি ২০০৯-এ 'দশরূপক' নামে ছোট নাটকের সংকলনে প্রকাশিত।

৮০. রাক্ষস: কলাভৃৎ পাবলিশার্স থেকে জানুয়ারি ২০০৯-এ 'দশরূপক' নামে ছোট নাটকের সংকলনে প্রকাশিত।

৮১. ষোলোপাতা : নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন থেকে ২০১৬-এর জানুয়ারিতে মোহিত চট্টোপাধ্যায় অণুনাটক সংগ্রহে প্রকাশিত।

৮২. ইন্টারভিউ : প্রথম প্রকাশ গণনাট্য পত্রিকা সেপ্টেম্বর-অক্টোবর সংখ্যা ২০০৯ সালে। ২০১৬ জানুয়ারিতে পুনর্মুদ্রিত নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন থেকে পুনর্মুদ্রিত 'মোহিত চট্টোপাধ্যায় অণুনাটক সংগ্রহ' গ্রন্থে।

৮৩. কাঁথা: গণনাট্য সেপ্টেম্বর-অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত ২০০৯-এ। নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন থেকে ২০১৬ জানুয়ারিতে 'মোহিত চট্টোপাধ্যায় অণুনাটক সংগ্রহে' পুনর্মুদ্রিত।

৮৪. ভূতনাথ: 'নাট্যচিন্তা ২৯, নভেম্বর ২০০৯- এপ্রিল ২০১০'৫

৮৫. মায়ের মতো : ২০০৯-এ রঙ্গপট পত্রিকায় প্রকাশিত।

৮৬. মুখ: ২০০৯-এ শারদীয় নাট্যসৃজনীতে (৬) প্রকাশিত। 'নাট্যচিন্তা' থেকে মোহিত চট্টোপাধ্যায় অণুনাটক সংগ্রহে পুনর্মুদ্রিত। ২০১৬-এর জানুয়ারিতে।

নাটকের পর্ব বিভাগ:

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের সমগ্র নাট্যজীবনকে দুটো পর্বে ভাগ করা যায়— প্রথম পর্ব ও দ্বিতীয় পর্ব। এই পর্ব বিভাজন করা হয়েছে তাঁর নাট্য কর্মের কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতার কারণে। তাঁর নাটক রচনার পিছনের যে দর্শন তার মধ্যেও তাঁর দ্বৈত সত্তা কাজ করেছিল। তিনি স্বয়ং বলেছিলেন, তাঁর নাটক রচনার পিছনে দুটো কারণ রয়েছে।

প্রথমত: ''... নাটক আমি লিখতে চাই কারণ এর মধ্যে এক ধরনের স্বাধীনতার স্বাদ পাওয়া যায়, বলা যেতে পারে Creative freedom। প্রথাসিদ্ধ চরিত্র ও আঙ্গিকের নাটক যাঁরা লিখছেন তাঁরা তো প্রচলিত নিয়মে বন্দী। তাঁদের তো বাস্তবের দৃশ্যমান জীবন অনুসরণ, অনুকরণ করতেই হয় কিন্তু আমি মনে করি, ফ্যান্টাসি, inner reality, abstraction বা Shadow of reality-কে আশ্রয় করে নাটক লিখলে বাস্তবকে সরিয়ে রেখে বাস্তবের মধ্যে নিহিত সত্যকে এক ভিন্ন চেহারায় প্রকাশ করা যায়। এ ধরনের সৃষ্টিতে লেখক তার রচনার চরিত্র, ঘটনা, আলো, বাতাস সব কিছু নিজে নিজেই সৃষ্টি করেন। স্রষ্টা এক্ষেত্রে ঈশ্বরের ভূমিকা নেন। তাঁর Creative freedom-ই তাঁকে ঈশ্বর করে তোলে। আমি লিখি, এই Creative freedom-এর মধ্য দিয়ে নিজের কল্পনাশক্তিকে তীব্র করে তুলতে।''[৮]

মূলত এই নাট্যদর্শনই তাঁর প্রথম পর্বের নাটকে দেখা যায়। প্রথম পর্বের নাটকে মানুষের অন্তর্বাস্তবতা বা inner reality-কে তিনি প্রকাশ করতে চেয়েছেন। তিনি তাঁর লেখায় বারবার বাস্তবিরোধী ননরিয়ালিস্টিক দর্শনকে নাটকে রূপ দেওয়ার কথা বলেছেন।

দ্বিতীয়ত: তিনি লিখেছেন, ''কেন লিখি তার প্রধান কারণ মানুষ এবং সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা। এমন একটা পরিবেশের মধ্যে আমরা রয়েছি যেখানে বেশিরভাগ মানুষ কোনও ক্রমেই সুখী নয়, অভাব অসন্তোষে তারা কন্টকিত, তাদের জীবন নিষ্প্রভ, স্বপ্ন বর্ণহীন, আশা দুরাশামাত্র। মানুষ যদি আন্দোলিত হয়ে না ওঠে এই বিধ্বস্ত জীবন সতেজ, সজীব এবং সুন্দর হয়ে উঠবে কেমন করে? অথচ গোটা পৃথিবীটাই যেন কিরকম আন্দোলনহীন। সঠিক রাজনীতির হাতেই রয়েছে এই ভগ্নদশার মধ্যে নতুন নির্মাণের শক্তি। কিন্তু কেবল রাজনীতিই নয়, শিল্প-সংস্কৃতির ভূমিকাও এক্ষেত্রে কম নয়। একজন

লেখককেও তাই সমাজ সচেতন, রাজনীতি সচেতন থেকে মানুষের জীবন ও পরিবেশ বদলে দেওয়ার, শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে মানুষকে প্রসন্নতা দেওয়ার দায়িত্ব নিতে হবে। একজন আদর্শ লেখক চিরকালই মানুষ ও সমাজের বিবেকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁর রাজনীতি এই বিবেকবোধ সঞ্জাত উপলব্ধি। তাই মানুষের কল্যাণকে উপেক্ষা করে যে লেখা তা বিবেকহীন বিভ্রান্তি। ...”[৯]

দ্বিতীয় পর্বের নাটকে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা, রাজনৈতিক সচেতনতা একটা নতুন মাত্রা, নতুন ব্যঞ্জনা নিয়ে আসে। মানুষ, সমাজ, রাজনীতির প্রতি বিবেকের ভূমিকায় দেখা যায় নাট্যকারকে।

মোহিত চট্টোপাধ্যায় সারাজীবনে অজস্র নাটক লিখেছেন। তিনি নিজস্ব ভাবনাজাত মৌলিক নাটক যেমন লিখেছিলেন, আবার অনুসৃজন, পুনর্লিখন ও সম্পাদনা করেছেন বহু নাটকের। তিনি বলেছেন—

> ‘‘লোকে যাকে মৌলিক বলে অর্থাৎ সবটাই আমার ভাবনা থেকে এসেছে, এই রকম নাটকও যেমন লিখেছি, তেমনি অন্যের নাটক পড়ে তাকে অবলম্বন করে আমার মনে যে নাটক এসেছে আমি তাও লিখেছি। আবার কিছু অনুবাদও করেছি। ... অনুবাদ যখন করেছি মূলের ওপর আনুগত্য বজায় রেখেই করেছি। ... যেটা অনুবাদ নাটক সেখানে আমি যথাসম্ভব আমার জ্ঞান বুদ্ধি মত মূলের অনুবাদ করেছি, এর মধ্যে ‘গালিলিওর জীবন’ ও ‘দি মার্চেন্ট অফ্ ভেনিস’ আছে। এমন অনেক নাটক আছে যা আমি না লিখলেও পারতাম। কিন্তু আমি মনে করি একজন নাট্যকার সৎ হবে এবং তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার কথা যতটুকু জানাবার জানাবেন যাতে অন্য একজন পড়ে বুঝতে পারেন।”[১০]

অনেক সমালোচক আছেন যারা শুধুমাত্র নিজস্ব ভাবনাজাত লেখাকেই মৌলিক নাটক বলে থাকেন। দেশি বা বিদেশি গল্প বা কাহিনির প্রভাব বা মিল থাকলে সেই লেখাকে আর মৌলিক হিসেবে স্বীকৃতি দেন না। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের কিছু নাটকেও বিদেশি কাহিনি বা ঘটনা বা চরিত্রের সাদৃশ্য থাকায় অনেকেই সেই নাটকগুলোকে মৌলিক বলে স্বীকার করেন না। কিন্তু তিনি অন্যের নাটকের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বা অন্য নাটকের অবলম্বনে লেখা নাটকগুলিকে মৌলিক মনে করেন। কেননা সেই লেখাগুলোর সঙ্গে অন্যের সাদৃশ্য থাকলেও তার মধ্যে যে বোধটা রয়েছে, সেটা একান্তভাবেই তার নিজস্ব। তিনি মনে করেন, মৌলিকভাবে আসা এবং মৌলিক হয়ে ওঠা দুটো একরকম নয়। কোন রচনা মৌলিক হয়ে ওঠার কারণগুলি হল—

মৌলিক মানে যেটা একান্তভাবেই নিজের মন থেকে উঠে আসে। অন্যের লেখার আদল নিজের লেখাতে থাকলেও তার মধ্যে দর্শন, বোধ, কথা সমস্তটাই যদি বদলে যায়, শুধুমাত্র অন্যের খাঁচাটা রয়ে যায় তাহলে সেটাকে মৌলিক বলতে দোষ কথায়। তিনি প্রশ্ন রেখেছেন—

> ‘‘শিল্পের অবলম্বন বা উপাদানকে চূড়ান্ত মনে করে শিল্পের মৌলিকত্বের বিচার যথার্থ হয় কি; দেশি বিদেশি, নিজস্ব ভাবনা— যেখান থেকেই নাটকের উপাদান সংগ্রহ করি না কেন, তা যথেষ্ট মূল্যবান হলেও নাটকের সর্বস্ব তো নয়। নাট্যকারের নিজস্ব ভাবুকতা,

সৃজন নৈপুণ্য যে নাটকের মধ্যে তাৎপর্য সৃষ্টি করতে পারে, আমার ধারণায়, সে-নাটক মৌলিকত্ব অর্জন করেছে— অন্য যে কোনো রচনার সঙ্গে তার যাবতীয় সাদৃশ্য ও সম্পর্ক সত্ত্বেও।"[১১]

তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, i. রামায়ণের কাহিনী অনুসরণ করে রচিত মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য'। ii. মহাভারতের ঘটনা অবলম্বনে রচিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গান্ধারীর আবেদন'। iii. শেক্সপিয়র তাঁর নাটকের নানা উপাদান সংগ্রহ করেছেন হলিনশেড-এর 'ক্রনিক্ল্', 'ওল্ডার পেজ' এছাড়া নানা 'টেল্স্' ও ইতিহাস থেকে।

কিন্তু তারপরেও কেউ ভুল করেও এই সৃষ্টিগুলোর জন্য মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও শেক্সপিয়র-এর মৌলিকতা নিয়ে প্রশ্ন করতে পারে না। তাই উপাদান গ্রহণ করে নয় সৃজনী শক্তি যে কোন রচনাকে মৌলিক হয়ে উঠতে সাহায্য করে। তিনি বলেছেন, ''আমার নাটকে আমিও নানা নাটক ও কাহিনী থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছি এবং নিজস্ব ভাবনা, দর্শন ও সৃজনীশক্তির গুণে তাকে মৌলিক করে তুলবার প্রয়াস পেয়েছি।"[১২] তিনি মনে করেন, যারা একশো শতাংশ মৌলিক রচনা বলে, সবটাই নিজের মন থেকে এসেছে বলে দাবি করে, তখনও তাতে ঋণ আছে— 'জীবনের কাছে পৃথিবীর কাছে।'[১৩] মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের অনেক নাটকই বিদেশী নাটক বা গল্পের অনুপ্রেরণা দ্বারা রচিত, তিনি সেটা স্বীকারও করেছেন সর্বত্র। অন্যের নাটকের ধাক্কায় নাটক লিখলেও তিনি সেটাকে মৌলিক বলেছেন। কেননা তিনি যখন কারও প্রেরণা দ্বারা কোন নাটক লেখেন, তখন তিনি সেটা সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে উপস্থাপন করেন। তা সত্ত্বেও অন্যের রচনার নাম ব্যবহার করার কারণ হল পাঠক যাতে দুটো নাটক পড়ে তার পার্থক্যটা বুঝতে পারে। তাঁর রচিত নাটকটি সত্যিই স্বতন্ত্র কিনা, তার মধ্যে মৌলিকতা আছে কিনা দুটো রচনা পড়লেই পাঠক তা অনায়াসে ধরতে পারবে।

তিনি বলেছেন, ''পৃথিবীতে চরম মৌলিক বলে কিছু নেই এবং বিজ্ঞান বলে ম্যাটারও উপাদানের সমষ্টি— নানা উপাদান তার মধ্যে থাকে। গোদা একটা খুব দামি কথা বলেন— তুমি কোথা থেকে কী নিয়েছ সেটা বড়ো কথা নয়— তুমি সেটাকে কোথায় নিয়ে গেছ সেটাই বড় কথা।"[১৪] এই বিষয়ে তিনি একটা উদাহরণ দিয়েছেন। যদি কারও প্রোট্রেট আঁকা হয়, তবে আর্টিস্টকে নিশ্চয়ই কাউকে না কাউকে দেখে তার পোট্রেটটা আঁকতে হবে। তাই বলে সেই পোট্রেটকে আমরা মৌলিক চিত্র না বলে পারি না। পৃথিবীতে বহু বিখ্যাত পোট্রেট এইভাবেই শ্রেষ্ঠ মৌলিক শিল্প বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। তিনি মনে করেন যে, কোন শিল্পের মধ্যে নিজের তিনটি জিনিস থাকলে তাকে মৌলিক বলা যেতে পারে। নিজস্ব কল্পনা, নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি এবং নিজস্ব আনন্দ—এই তিনটে উপাদান যে কোন লেখার মধ্যে থাকলে তা মৌলিক হতে পারে। নিজের লেখার ক্ষেত্রেও তিনি এই তিনটে জিনিসকে প্রধান গুরুত্ব দিয়েছেন। যার থেকে লেখার প্রেরণা পাওয়া যায় সেটা স্বীকার করে তার প্রতি যেমন কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে তেমনি সেই লেখাকে নিজের বলে দাবি করতেও কোন সমস্যা নেই বলে তিনি মনে করেন। এবিষয়ে একটা উদাহরণ তিনি সব সময় দেন। তিনি বলেন, ''এখানে আমি পোলভল্টের উদাহরণটাও দিয়ে থাকি— একজন যে

পোলভল্ট দেয়— যেমন একটা পোলের ওপর ভর দিয়ে ওপারে চলে যায় আর পোলটা ফেলে দেয়। আমিও তেমন একটা পোল নিয়েছি কিন্তু আমার গতি, আমার পটুত্ব দিয়ে আমি জাম্প দিয়ে ওপারে গেলাম, পোলটা ফেলে দিলাম। যেমন আমি তোমার হাতে একটা বল দেখতে পেলাম, বলটা নিয়ে আমি কিছু খেলা খেললাম। এখানে বলটা তোমার কিন্তু খেলাটা আমার। লেখার ক্ষেত্রটাও অনেকটা তাই। অনেক লেখাই বলটা জুগিয়ে দেয়, কিন্তু আমি আমার খেলাটাই খেলি আর এই খেলাটাকে মৌলিক খেলাই বলুন— এই আমার আবেদন।"[১৫]

প্রথম পর্বের নাটক:

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকের প্রথম পর্বে প্রবেশ করার পূর্বে মনে রাখা দরকার তার জীবনে আরো একটি পর্ব ছিল— তা হল কবিতা রচনার পর্ব। নাটক রচনার পূর্বে তিনি কবি ছিলেন। কবিতাই তাঁকে নাটক লেখার জন্য প্রেরণা যুগিয়েছিল বলে তিনি জানিয়েছেন। কবিতার মধ্যে দিয়ে তিনি নিজেকে আর ছাড়িয়ে যেতে পারছিলেন না বলে তিনি নাটক লেখা শুরু করেছিলেন। তাঁর বহু কবিতার মধ্যে প্রথম থেকেই ড্রামাটিক অ্যাকশন, সংলাপ লুকিয়ে ছিল। অনেক কবিতাই যেন নাটক হয়ে উঠতে চাইত।

১. 'গোলাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'র প্রথম কবিতা: 'প্রেম পুনর্বার'—

'' হে স্নেহ আস্বাদিত দুঃখ তুমি বাম পার্শ্বে বোস
আর এই সুমঙ্গল রমণী দক্ষিণে;
আমি মধ্যবর্তী থাকি, কথা বল তোমরা দুজনে
কলহ কোর না, উর্দ্ধে গোধূলির আলো বড় নির্জনতা প্রিয়।"[১৬]

২. 'শবাধারে জ্যোৎস্না'র ১৪৫ নং কবিতা—

''কলকাতা, তোমাকে কিছু সময় দিলাম
যদি পারো বদলে দাও
অন্যথায় বালিশের ম্রিয়মান নীচে
ডিনামাইট রেখে দিয়ে চোখ বুজে ঘুমোব নির্জনে
যে রকম পান মুখে অনেকে ঘুমোয় শান্ত ছুটির দুপুরে।"[১৭]

৩. 'গোলাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'র 'তাকে বোলো' কবিতা—

''তাকে বোলো-যদি কোনো রিক্ত মাঠে দেখা হয়ে যায়
ফিরে আসা ভুল হবে, তবে ফিরে যেন সে তাকায়।।"[১৮]

৪. 'অঙ্কন শিক্ষার' সিঁড়ি আঁকা কবিতা—

অর্থাৎ সমস্যা বহু, বহু ক্যানভাস সাদাই থাকুক—
সংক্ষেপে সংকেতময় কিছু একটা এঁকে নিন দ্রুত
যেমন হাতছানি—
সম্ভবত এটাই প্রকৃত সিঁড়ি।"[১৯]

এরপরে 'ভালোবাসা, ভালোবাসা' কাব্যগ্রন্থের পরে তার আর কোন কাব্যগ্রন্থ বেরোয়নি। ষাটের দশকে তাঁর নাটক লেখা শুরু। মোহিত চট্টোপাধ্যায় কর্মসূত্রে কলকাতার ব্যস্ততম নাগরিক জীবন থেকে চলে এসেছিলেন আধা-নগর আধা-গ্রাম ও ইতিহাসের ঐতিহ্যবহনকারী মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুরে। সেখানে কলেজে অধ্যাপনার সূত্রে তার সঙ্গে প্রচুর ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে যেমন যোগাযোগ তৈরি হয়েছিল, তেমনি তিনি পেয়েছিলেন প্রচুর অবসরকালীন সময়। এই সময় তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে সৃষ্টিশীল সুস্থ সংস্কৃতির চর্চায় উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং কলেজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নানা নাটকও পরিচালনা করেছিলেন। এখান থেকেই তাঁর নাটকের প্রতি একটা আলাদা আকর্ষণ তৈরি হতে থাকে। মোহিত বন্ধু কথাসাহিত্যিক বীরেন্দ্র দত্ত এই প্রসঙ্গে বলেছেন—

> '' এই যে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে নাটক অভিনয়ের 'ইনভলভমেন্ট', এতেই ধীরে ধীরে কুঁড়ি থেকে ফুল হয়ে ওঠার মত কখন যেন কবি মোহিতের 'ইমেজ'-কল্পনা নাটকের আঙ্গিকে ভিন্ন প্রতীকের মাত্রা ও ব্যাখ্যা পেতে থাকে।''[২০]

কলকাতায় থাকাকালীন সময়ে মোহিত চট্টোপাধ্যায় ছোট থেকেই বিভিন্ন লাইব্রেরি থেকে অজস্র বিদেশী নাটকের বই পড়েছিলেন। ফলে তখন নাটকের প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহ না থাকলেও নাটক সম্পর্কে তার জ্ঞান ছিল অগাধ। ছুটি পেলে কলকাতায় এসে কবি বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় কলেজ ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে নাটক মঞ্চস্থ করানোর কথা সবসময় বলতেন। তখন থেকে কবি বন্ধুরা বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর মধ্যে একটা বদল আসছে। শিল্প ভাবনার আধার বদলে তিনি কবি থেকে নাট্যকার হওয়ার চেষ্টা করছেন কখনো নিজের অজান্তে কখনো জেনে বুঝেই। কবিসত্তা ও নাট্য সত্তার এই দ্বন্দ্ব তাঁর 'অঙ্কন শিক্ষা' কাব্যগ্রন্থে ধরা পড়েছে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর নাটক সত্তাই জয়ী হয়েছে।

বীরেন্দ্র দত্ত মনে করেন মোহিত চট্টোপাধ্যায় কবিতা লেখা ছেড়ে নাটককে নিজের করে নিলেও তিনি আগে কবি, পরে নাট্যকার। তিনি বলেছেন,

> ''মোহিত কিন্তু কবিতা থেকে ক্রমশ যখন নাটকে এসেছে, তখন সে গতানুগতিক সাধারণ সামাজিক-ঐতিহাসিক-পৌরাণিক নাটকের কথা আদৌ ভাবেনি; আসলে তার কবি মনে, আধুনিক সচেতন কবি-মননে তা হতেই পারে না। মোহিত যেমন কবিতা লিখেছে, তেমনি পাশাপাশি দীর্ঘ কবিতা লেখার পর অসাধারণ সব কাব্যনাট্যও ! কবিতা থেকে কাব্যনাট্যে আসা-একটা ফর্ম ছেড়ে আর একটা ফর্ম গ্রহণ। আবার কাব্যনাট্য থেকে এসেছে অ্যাবসার্ড ড্রামায়— কবিতায় কবির বিশেষ প্রতীক নাটকের রহস্য ও ব্যঞ্জনায় পেয়েছে একাধিক 'ডাইমেন্‌শান', হয়েছে নির্বিশেষ, তাই সে একসঙ্গে হাজার হাজার দর্শককে ধরতে পারে। আর মোহিত সেই কবিতাতেই যে থেকে গেছে, তার নাটকে সংলাপ, কৌতুকরস, তার প্রসঙ্গ ও লক্ষ্য, পরিবেশ ও অসীমতা তারই সম্যক সমর্থন জানায়।
>
> মোহিত কবিতা লিখছে না, আর কোনোদিন লিখবে কিনা জানি না, তবে নাটকের মধ্যে সে, সেই কবি, গভীরভাবে ওতপ্রোত। কবি মোহিতকে নাট্যকার মোহিত থেকে

একেবারে সরিয়ে আনা অসম্ভব। আসলে মোহিতের কবিতার মধ্যেই নাটক ছিল। তখন তার কবিতায় নাটকের প্রাণ ছিল, পোষাক ছিল না, প্রতীক ছিল Action ছিল না। মোহিতের একাধিক নাটকের যে সব অসাধারণ প্রতীকী সংলাপ, সে সবের যে বিস্ময়কর দ্যুতি, তাৎপর্য, বিশুদ্ধ কৌতুক-শ্লেষ-ব্যঙ্গের অভিঘাত, মোহিতের প্রথম দিকের কবিতায় থেকে গেছে গভীরে-নিবিড়ে।"[২১]

তাঁর শেষ কবিতা ছিল—

"আমরা চাইনি কেউ অমন সুন্দর স্নাইপ মরে যাক গোধূলি বেলায়
প্রণয় নিরত ঘুঘু দম্পতির মৃত্যুও ভাবিনি
ভূলুণ্ঠিত হাঁসগুলি ভেবেছিল সাইবেরিয়ায় ফের চলে যাবে
ওদের মায়ের দুঃখ কোনও কালে চাইনি কখনো।"[২২]

কর্মসূত্রে জঙ্গিপুরে থাকাকালীন শিকারে বেরিয়ে, নিজের হাতে বন্দুক দিয়ে গুলি করে স্নাইপ মেরে এই কবিতাটি লিখেছিলেন তিনি। ১৯৭২ সালের পর তিনি আর কবিতা লেখেননি। কবিতা থেকে তিনি পুরোপুরি নাটকের জগতে চলে এসেছিলেন। কবিতা ছাড়লেও তাঁর মধ্যে কবিত্ববোধ ছিল পুরো মাত্রায়। তিনি বলেছিলেন,

"কবিত্ব বৈদ্যুতিক শক্তির মতো। বৈদ্যুতিক শক্তি দিয়ে যেমন ট্রাম চালানো যায়, পাখা চালানো যায়, ট্রেন চালানো যায়— কবিত্বকেও তেমনি, গল্পে প্রকাশ করা যায়, ছবিতে প্রকাশ করা যায়, চলচ্চিত্রে প্রকাশ করা যায়— এমনকি নিজের জীবনেও প্রকাশ করা যায়।"[২৩]

এই কবিত্বকেই তিনি নাটক রচনায় কাজে লাগিয়েছিলেন। বিশেষ করে তাঁর প্রথম পর্বের নাটকে। কবিতা থেকেই তিনি নতুন কল্পনার জগৎ, নতুন কণ্ঠস্বর, নতুন চোখ, নতুন একটা হৃদয় পেয়েছিলেন— যা দিয়ে তিনি নাটক লিখলেন। তাঁর প্রথম পর্বের নাটকের সংলাপে এই কবিত্বের ব্যবহার তাঁর নাটককে একটা অন্য মাত্রা দিয়েছিল। এই পর্বের নাটক যেন কবিতা হয়ে উঠেছিল।

মোহিত চট্টোপাধ্যায় নাটক রচনায় শুরু থেকেই বাস্তবতার পরিবর্তে বাস্তব বিরোধী ননরিয়ালিস্টিক ধারার নাটক রচনা শুরু করেছিলেন। তাই তাঁর নাটকে প্রথম পর্বের ননরিয়ালিস্ট ধারার ইনার রিয়ালিটি বা অন্তর্বাস্তবতা, ফ্যানটাসি, বিমূর্ততা, পরাবাস্তবতা, অ্যাবসার্ড বা অর্থহীন উদ্ভটতা, অস্তিত্বের অর্থহীনতা, প্রতীক, সংকেত, যাদুবাস্তবতা, এক্সপ্রেশনিজম প্রভৃতি বিদেশী নাট্যদর্শনের প্রভাব দেখা দিয়েছিল। তাঁর বাস্তবতার পরিবর্তে ননরিয়ালিজমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়ার পিছনে কারণগুলি হল—

প্রথমত: মোহিত চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে বাস্তবতা' প্রবন্ধে বলেছেন—

"Realism চায় illusion of recreated life, in its immediacy and dense actuality, superficial reality বা appearence-কে তা মান্য করে। কিন্তু একজন শিল্প স্রষ্টার কল্পনাশক্তি superficial reality-র মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না, surface reality-র

pretension, limitation তাঁকে পীড়িত করতে থাকে, তাঁর inner vision of dream, dark, grotesque মুক্তির পথ খোঁজে।"[২৪]

ফলে স্রষ্টা বাস্তবতার একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে এক প্রকার দমবন্ধ অবস্থার অস্বস্তি অনুভব করতে থাকেন। তিনি নিজেকে স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে প্রকাশের তাগিদ অনুভব করেন এবং অবাস্তব প্রকাশভঙ্গিকে আশ্রয় করেন।

দ্বিতীয়ত: ''মানুষের জীবন বহুমাত্রিক এবং বহুস্তরে সমন্বিত। তার যতটুকু দেখি, তার চেয়ে না দেখা অংশ অনেক বেশি। Iceberg-এর মতো এর একভাগ জলের ওপরে, বাকি ন'ভাগ জলের তলায় দৃষ্টির অগোচরে থাকে। এই বাইরের মানুষটা এবং তার ভেতরের মানুষটা দু'রকম এবং এই দুইকে মিলিয়েই একটা মানুষ, একটা গোটা মানুষ।"[২৫] এই মানুষটাকেই তিনি প্রকৃত মানুষ বলেছেন। বাস্তববিরোধী সাহিত্য এই সম্পূর্ণ মানুষটাকে প্রকাশ করতে চায়। রিয়ালিস্ট সাহিত্যও এই প্রকৃত মানুষকে ধরতে চায়, কিন্তু সত্যকে ধরতে গিয়ে বাহ্যিক-বাস্তব বা বাস্তবের অনুকরণের প্রতি আকর্ষণ বেশি থাকায় রিয়ালিস্ট শিল্প-সাহিত্য মানুষের বহুমাত্রিকতা প্রকাশ করতে পারে না। তিনি বলেছেন— ''একই মানুষের ভেতরে আর বাইরের চেহারা, চরিত্র, আচরণ মিলেমিশে যে Chemistry তৈরি হয়। যে essence বা truth ধরা পড়ে, realism-এ সেভাবে আসে না।"[২৬]

তৃতীয়ত: বাস্তবধর্মী শিল্পদর্শন সমস্ত শিল্পে কার্যকরী নয়। নৃত্য ও সংগীতের ক্ষেত্রে বাস্তবতার ততটা প্রয়োগ হয় না। কবিতা বাস্তবের উপর ভর করে চলতে পারে না। তিনি বলেছেন— "Poetry is never real-তা এই natural world-এর কথা বলে, But its vision exceeds or defies its laws—it is a sincere liar. কবিতায় concrete world আসে abstract form-এ। Karl sandburg-এর কথা এ প্রসঙ্গে মনে আসে— 'Poetry is an echo, asking a shadow to dance'. Realism hesitates to ask a shadow to dance. Realism-এর Passport নেই নৃত্য, সংগীত বা কবিতার সীমান্তে অনুপ্রবেশের। তেমনই realism অচল cartoon, animation, graphics-এর শিল্পকর্মে।"[২৭]

চতুর্থত: রিয়ালিজমের মাধ্যমে শিল্প-সাহিত্য-নাটকের প্রকাশের সমস্যা তার আবির্ভাবের সময়কাল থেকেই শুরু হয়েছিল। ইবসেনকে রিয়ালিজমের জনক বলা হলেও তিনি শেষের দিকে নাটক রচনায় রিয়ালিজমের মাধ্যমে সবটা প্রকাশ করতে পারেননি। তাই তিনি বাস্তবতার সঙ্গে প্রতীক এবং স্বপ্নদর্শী কিছু উপাদানকে যুক্ত করলেন। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের মতে, ''সেই রকমই ঘটল strindburg-এর নাটকে। বাস্তবতার জগৎ ছেড়ে তিনি এলেন subjective works-এ তিনি হলেন inner imagination of dreams-এর অনুসন্ধানী, dark and grotesque হয়ে উঠল তাঁর রচনার Climate, যা অনেক সময়ই shocking। ঠিক এভাবেই realism থেকে শুরু করে জার্মানির Frank Wedekind শেষের দিকে পথ প্রস্তুত করলেন non-realistic expressinistic নাটকের।"[২৮] এইভাবেই দেখা যায় বারবার রিয়ালিজমের সঙ্গে দ্বন্দ্ব হয়েছে শিল্পী ও স্রষ্টার, বেশিরভাগ সময় তাঁরা বিদ্রোহ করে রিয়ালিজমের সঙ্গে নতুন কিছু যুক্ত করেছেন, কখনো আবার রিয়ালিজমকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম পর্বের নাটকগুলি ইউরোপ-আমেরিকায় বিংশ শতাব্দীর শুরুতে, প্রথম-দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমসাময়িক ও তৎপরবর্তী ননরিয়ালিস্টিক বা ইনাররিয়ালিস্ট শিল্প- সাহিত্য-নাট্য আন্দোলনজাত তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত। তাই তার এই পর্বের নাটক সম্পর্কে বিস্তারিত বিশ্লেষণের আগে পাশ্চাত্যের বাস্তববিরোধী সাহিত্য-দর্শন-নাট্য আন্দোলনগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন।

সিম্বলিজম (Symbolism):

১৮৯০ সালে সিম্বলিজম বা প্রতীকবাদ নামে আন্দোলনের জন্ম হয়। ফ্রান্সের প্যারিস শহরে চিত্রশিল্পী, সাহিত্যিক, কবি, নাট্যকারেরা এই আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিলেন রিয়ালিজম ও ন্যাচারিলজমের বিরুদ্ধে তথা প্রতিক্রিয়ায়। প্রতীকবাদীরা জীবনের বাস্তব প্রকাশের পরিবর্তে জীবনের অন্তর্সত্যকে তুলে ধরতে চাইলেন। তাঁরা বললেন জীবনের অন্তর্বাস্তবতা বা সত্যকে যুক্তির দ্বারা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তা স্পষ্টভাবেও ফোটানো সম্ভব নয়। সেটা একমাত্র সম্ভব প্রতীকের মাধ্যমে। এবং প্রতীকের মাধ্যমে জীবনকে ধরার জন্য গদ্যের পরিবর্তে কাব্যিকতার দরকার। তারা জীবনের পরিবর্তে জীবনের প্রতীককে তুলে ধরতে চাইলেন। সিম্বলিস্টরা বললেন যে—

> '' সজ্ঞার মাধ্যমেই উপলব্ধি ও অনুধাবন করতে হয়; এবং সেহেতু এমন প্রতীকের মাধ্যমে তার (সত্যের) সংকেত বা ইংগিত দান করতে হবে যা অনুভূতি ও মানস চেতনাকে উত্তেজিত করতে পারে এবং মানস অনুভূতিলব্ধ সত্যকে প্রকাশ করতে পারে। নাট্যকার-প্রযোজক যেভাবে প্রতীককে উপলব্ধি করতে পারেন, পাঠক-দর্শকও সেভাবেই করবে। আর তাই সিম্বলিস্টরা এমন একটি non-realistic থিয়েটার চাইলো যা অতিরিক্ত পুঙ্খানুপুঙ্খতা (detail) ও অতি সাধারণ পার্থিবতার পরিবর্তে আনবে বিমূর্ততা, চিন্তা ও অনুভূতির স্বাধীনতা।''[২৯]

পর্যবেক্ষণের বিশুদ্ধতার চেয়ে তাঁরা চেয়েছিলেন কল্পনার বিশুদ্ধতা, দৃষ্টির বিশুদ্ধতা, দর্শনের বিশুদ্ধতা। আত্মসচেতনতার সৃজনশীল উদ্ভাবন ছিল তাঁদের প্রাথমিক কাজ। রিয়ালিজমের আত্মিক চেতনাহীনতার বিরুদ্ধে তাঁরা ছিল খড়্গহস্ত—

> ''এবং তার স্থলে থাকবে কাব্যিক মূর্চ্ছনা ও রূপকল্প, ফ্যান্টাসি, ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি, বৌদ্ধিকতা, দুঃসাহসিকতা, মনোহারিত্ব, অতিমানবিক বিশালতা ও অন্তর্গত সত্যের অভিব্যক্তি।''[৩০]

এছাড়া আমরা আমাদের জগতের সঙ্গে পরিচিত হই, আমরা অন্যকে পরিচয় করাই প্রতীকের সাহায্যে। আমাদের জীবন-যাপনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে রয়েছে প্রতীক। যেখানে আমরা সম্পূর্ণভাবে প্রতীকের জগতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছি সেখানে বাস্তবধর্মী সৃষ্টি আবেদন ফেলতে পারে না। মোহিত চট্টোপাধ্যায় বলেছেন—

> ''যথার্থই We live our lives in and through symbols. We have been developing symbol processing brains. Words, descriptions, sings, icons and numbers

are our natural habitat. কোন কোন anthropologist তাই বলেছেন, human being হচ্ছে Homo symbolicus. যদি তাই হয়, তাহলে এমন পৃথিবীতে realism-এর জোর কোথায়?"[৩১]

সুররিয়ালিজম (Surrealism):

বিশ শতকে সুররিয়ালিজম বা পরাবাস্তবতাবাদ একটি ননরিয়ালিস্টিক শিল্প-সাহিত্য আন্দোলন হিসেবে পরিচিত। সিম্বলিজমের প্রভাবেই এর উৎপত্তি। ডাডাইজম ও কিউবিজমের প্রভাবও লক্ষ করা যায় এই শিল্প-সাহিত্য-দর্শনে। ডাডাইজমের অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সুররিয়ালিজমের উদ্ভব ঘটে। ১৯২৪ সালে সুররিয়ালিজমের ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করেন ডাডাইস্ট কবি-চিত্রকর আর্দ্রে ব্রেতো। David Hopkins তাঁর 'DADA AND SURREALISM' গ্রন্থে বলেছেন—

"Surrealist artists such as Max Ernst, Salvador Dali, Joan Micro, and Andre Masson conducted an often turbulent love affair with psychoanalysis aiming to plumb the mystries of the human bizzarre mind ... surrealism as similarly antibourgeois in spirit but more deeply immersed in the surealism had more of a restorative mission, attempting to create a new mythology and put modern man and woman back in touch with the forces of the unconscious. ...

Surrealism especially has entered our every day language; we talk of 'surreal humour' or a 'surreal plot' to a film. ...

Surrealism's current popularity in culture at large it is safe to assume that the 'darker', unconcious aspects of our psychic lives, which were celebrated by both Dada and surrealism, are now widely thought to be 'positive' thing."[৩২]

সমকালীন নাটকেও সুররিয়ালিজমের প্রভাব লক্ষ করা যায়। কবি অ্যাপোলিনেয়ার-এর মতে,

''সমকালীন থিয়েটারের দায়িত্ব হচ্ছে নাটকের প্রধান চরিত্রকে (Protagonist) অবশ্যই বিশ্ব চরাচরের সামগ্রিকতার সঙ্গে সম্পর্কিত হতে হবে এবং প্রকৃতিকে খণ্ড খণ্ড ভাবে না দেখে তার সার্বিক অবস্থান ও ভূমিকার সমন্বয়ে দেখতে হবে; কারণ আগের থিয়েটার মানুষকে শুধু খণ্ডিত ভাবে সম্পর্কিত করেই দেখেছে। তিনি মানুষের যে কোনো কর্মকৃতির পেছনে যে উদ্ভাবনা ও প্রেরণা থাকে তার সঙ্গে সুররিয়ালিজমকে অভিন্নরূপে গণ্য করেছেন।"[৩৩]

সুররিয়ালিজম ছিল রিয়ালিজমের বিপরীতে আত্মিক ও সচেতন এবং সাবকনসাস বা অবচেতন মনের ক্রিয়াকলাপ বর্ণনা। এটি ছিল যুক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতার চর্চা বা যে কোন নান্দনিক, নৈতিক নির্দেশ নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ। সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের সাবকনসাস মনের তত্ত্ব দ্বারাও সুররিয়ালিস্ট দর্শন প্রেরণা

পেয়েছিল। সুররিয়ালিজম মূলত জোর দিয়েছিল—

> ''... বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে মানসিক অবচেতনার প্রতিক্রিয়ার উপর। উদ্ভট রূপকল্পের (grotesque images) উপস্থাপনার মাধ্যমে এক স্বপ্নের জগৎ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কল্পনাকে জাগিয়ে তোলা ছিলো তার শৈল্পিক দর্শন। সুররিয়ালিজম চেয়েছে জাগ্রত আর ঘুমন্ত অবস্থা, শারীরিক ও আত্মিক বাস্তব ও অবাস্তব-এ সবের ভেদাভেদ ঘুঁচিয়ে দিতে।''[৩৪]

সুররিয়ালিজম মূলত ফ্যানটাসি এবং স্বপ্ন জগতের বিস্তারের দ্বারা গড়ে ওঠে।

এক্সপ্রেশনিজম (Expressionism):

এক্সপ্রেশনিজম বা অভিব্যক্তিবাদ বাস্তব বিরোধী ননরিয়ালিস্টিক শিল্প সাহিত্য আন্দোলনের মধ্যে প্রতিনিধিস্থানীয় আন্দোলন। বিংশ শতকের শুরুতেই এই আন্দোলনের জন্ম। এক্সপ্রেশনিজম অবজেকটিভ বা বস্তুগত বাস্তবতার পরিবর্তে আত্মগত, ভাবগত সত্য এবং ঘটনাবলী বর্ণনা করার কথা বলেছিল। এক্সপ্রেশনিস্ট শিল্পী তার আত্মগত আবেগ প্রকাশ করবেন ক্ষয়, অত্যুক্তি, প্রাইমিটিভিসম্, ফ্যান্টাসি, অত্যুজ্জ্বল, আবেগপূর্ণ, অনৈক্য, ও গতিশীল আবেদনের দ্বারা। জার্মানিতে এর জন্ম হলেও সমস্ত ইউরোপ ও আমেরিকাতে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল।

নাটকের জগতেও এই আন্দোলন প্রভাব ফেলেছিল। শ্রেয়ার নামে এক্সপ্রেশনিস্ট শিল্পী বলেছিলেন, নাট্যদর্শকদের আত্মাকে ছোঁয়ার কথা। ফলে একটা শক্তিশালী এবং নন-ইনটেলেকচুয়াল প্রভাব তৈরি হওয়ার সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন তিনি। জিয়া হালদারের 'নাট্যকথায় বিভিন্ন ইজম ও এপিক থিয়েটার' বইতে পাই—

> ''যেখানে অন্যান্য এক্সপ্রেশনিস্ট স্রষ্টাগণ নাট্যকার, নাট্য ও অভিনেতাদের অভিজ্ঞতা ও মঞ্চ দৃশ্যের মাধ্যমে এক্সপ্রেশনিস্ট দর্শনকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন, সেখানে শ্রেয়ার চেয়েছেন বিদ্যুৎরেখা যেমন করে চকিত আলো বিচ্ছুরণ করে তেমনিভাবে তার অভিনেতাদের এক্সপ্রেশনিস্ট পরিবেশের দ্বারা দর্শকের মনে একই সঙ্গে একাধিক অনুভব ও দার্শনিক চিন্তাকল্পনা জাগ্রত করাতে।''[৩৫]

এক্সপ্রেশনিস্ট শিল্পীরা সত্যকে উপস্থাপন করতে চেয়েছিলেন ননরিয়ালিস্টিক উপায়ে। বাহ্যিক ঘটনার চেয়ে তারা যে কোন ঘটনা বা সত্যকে প্রথমে নাটকের বিষয় করলেও—

> ''সেই ঘটনাকে নিজের বোধ, উপলব্ধি ও আবেগানুভূতির দ্বারা জারিত করে নেন, তা থেকে যে 'সত্য' তারা অনুধাবন করেন, যে 'স্বপ্ন' তারা সৃষ্টি করেন তা-ই নাট্যায়িত করেন। অর্থাৎ তারা বাস্তবকে বা বাইরের পৃথিবীকে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একান্ত আত্মগত বোধ ও ধারণার আলেখ্য রূপে প্রকাশ করেন। এক্সপ্রেশনিস্ট নাট্যকারেরা যেমন নিজেরা, তেমনি তাদের চরিত্ররাও 'ব্যক্তি' (ivndividual) ও আমি' (I) রূপে বা 'বহিরাগত' (stranger) রূপে উপস্থিত হয়ে নিজেকে বাইরের পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে ... এই যে নিজেকে বিচ্ছিন্ন (আত্মবিচ্ছিন্নকরণ) তা-ই এক্সপ্রেশনিস্ট নাট্যস্রষ্টাদের মৌল চালিকা শক্তি। তাদের

চরিত্ররা তাই হয়ে ওঠে নিঃসঙ্গ, একাকী।”[৩৬]

এক্সপ্রেশানিস্ট নাটকের সংলাপ কথোপকথনের বিপরীতে কাব্যিক উত্তেজনাপূর্ণ, জমকালো, মহাকাব্যিক ধরনের হবে। অনেক সময় এখানে সংলাপ দীর্ঘ গীতিময় স্বগোতক্তির মতো মনে হয়, আবার একসময় একটি বা দুটি শব্দ দিয়ে একটি বাক্যাংশ গঠন হতে পারে, আবার অনুপূরক শব্দ, কাটা কাটা শব্দ দিয়েও বাক্য উচ্চারিত হতে পারে। পিরানদেল্লা যে ‘স্পোকেন অ্যাকশন্’-এর কথা বলেছেন তার বিপরীতে এর সংলাপ অবস্থান করে।

J.L. Styan তাঁর 'Modern Drama in Theory and Practice (3)' গ্রন্থে এক্সপ্রেশানিস্ট নাটকের সংলাপ সম্পর্কে বলেছেন—

> "The dialogue, unlike conversation, was poetical, febrile, rhapsodic. At one time it might take the form of a long lyrical monologue, and at another, of staccato telegraphese– made up of phrases of one or two words or expletives. The lines made no attempt to obey the laws of pirandello's 'spoken action', in which the words directed the actor's movement and gesture, but they tried instead to evoke sympathetic feeling directly."[৩৭]

অস্তিত্ববাদ (Existentialism):

অস্তিত্ববাদী দার্শনিক লেখকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল Soren kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Friedrich Nietzsche, Franz Kafka, Albert Camus প্রমুখ।

'Existentialism'-শব্দটি প্রথম উদ্ভাবন করেন দার্শনিক কিয়ের্কগার্দ। তাঁর মতে অস্তিত্ববাদ হল, সমস্ত বিশুদ্ধ বিমূর্ত চিন্তার প্রত্যাখ্যান এবং বিশুদ্ধ যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক দর্শনের অবিশ্বাস; সংক্ষেপে যুক্তির সার্বভৌমতার অস্বীকৃতি। কিয়ের্কগার্দের মূল আগ্রহ ছিল মানুষের আত্মোপলব্ধির সম্ভাবনার বিষয়ে। তিনি জানতে চেয়েছিলেন, প্রতিদিনের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, আধিপত্যবাদ এবং ভুলে যাওয়া থেকে সরিয়ে নিয়ে মানুষ কী পরিমাণে নিজেকে উপলব্ধি করতে পারে। কিয়ের্কগার্দের মতে,

> ‘‘অস্তিত্বশীল হওয়ার অর্থই হলো মনোনয়ন করা, কর্ম করা, জগতের সঙ্গে ‘জড়িত’ হওয়া, বাস্তব জীবন ধারণ করা, বাস্তব জগৎ থেকে সরে এসে বিমূর্ত চিন্তায় বাস করা নয়। আমাদের যে স্বানুভবসিদ্ধ আত্মা তা বহিঃরাজ্যে নেই, আছে আন্তঃরাজ্যে। এ আত্মা জ্ঞানাত্মক আত্মা নয়, নৈতিক ক্রিয়ার বার্তা।”[৩৮]

অস্তিত্ববাদ দাবি করে মানুষ স্বাধীন, সে স্থিরীকৃত বা পূর্ব থেকেই নির্ধারিত কিছু নয়। মানুষ যেটা নির্বাচন বা পছন্দ করে সেটাই করে, আর তাই সে হয়ে ওঠে। মানুষকে অবশ্যই তার নিজস্ব মূল্যবোধগুলি খুঁজে পেতে হবে এবং নিজের জন্য সিদ্ধান্ত নিতে হবে সে যে কাজটি করবে।

বৈশিষ্ট্য:

অস্তিবাদের কিছু বৈশিষ্ট্য হল—

i. অস্তিত্ব সর্বদা বিশেষ এবং স্বতন্ত্র।

ii. অস্তিত্বই অস্তিত্বের মূল সমস্যা। অস্তিত্ববাদ অস্তিত্বের অর্থ সন্ধান করে।

iii. অস্তিত্বের অর্থ খুঁজতে গিয়ে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সম্ভাবনার মুখোমুখি হতে হয়, যার মধ্যে থেকে বিদ্যমানদের অবশ্যই একটি নির্বাচন করা উচিত। যার জন্য তাকে অবশ্যই নিজেকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করতে হবে।

iv. অস্তিত্ব সর্বদা বিশ্বজুড়ে থাকে এবং মূর্তরূপে এবং ঐতিহাসিকভাবে দৃঢ়বদ্ধ পরিস্থিতির তৈরি করে যা সীমাবদ্ধ এবং শর্তসাপেক্ষ।

অস্তিত্ববাদ ব্যক্তির অন্তর্জগতের মধ্যে মূলত আলোকপাত করে। ব্যক্তির নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং জীবনের সঙ্গে অস্তিত্ববাদী দর্শন যুক্ত। অস্তিত্ববাদ অনুসারে,

> ''মানব অস্তিত্বের আসল রহস্য বুদ্ধি বা চিন্তার মাধ্যমে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় বেঁচে থাকার বাস্তবতার মধ্যে। ... 'বেঁচে থাকা' (to live) আর 'অস্তিত্বশীল হওয়া' (to exist) এক নয়। অর্থহীন জীবনযাপন করাকে 'বেঁচে থাকা' বলা যায়, কিন্তু 'অস্তিত্বশীল হওয়া' বলা যায় না কিছুতেই।''[৩৯]

অস্তিত্ববাদীরা মনে করেন, 'Existence comes before its essence' অর্থাৎ অস্তিত্বের অবস্থান সারধর্মেরও আগে। ''যে বৈশিষ্ট্যের জন্য কোন বস্তু যা তাই হয়েছে, তাকেই সেই বস্তুর সারধর্ম বলা হয়।''[৪০] ভাববাদী দার্শনিকেরা সর্বদা অস্তিত্বকে গুরুত্ব না দিয়ে 'সারধর্ম'কেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন মানব জীবনের রহস্য উদ্ঘাটনে ও ব্যাখ্যায়। কিন্তু অস্তিত্ববাদীরা অস্তিত্বকেই মুখ্য স্থান দিয়েছেন সর্বত্র। Jean Paul Sartre অস্তিত্ববাদের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন,

> "Atheistic existentialism, which I represent, is more consistent. It states that if God does not exist, there is at least are being in whom existence precedes essence-- a being whose existence comes before its essence, a being who exits before he can be defined by any concept of it. That being is man, or as Heideggar put it, the human reality."[৪১]

অস্তিত্ব সারধর্মের পূর্বসূরী বলতে তিনি বুঝিয়েছেন, যে মানুষ প্রথমে অস্তিত্ব লাভ করে, সে পৃথিবীতে রূপ নেয়, নিজের মুখোমুখি হয় এবং তারপরেই নিজেকে সংজ্ঞায়িত করে। অস্তিত্ববাদী হিসেবে মানুষের কল্পনায় যদি তাকে সংজ্ঞায়িত করা যায় না, তার কারণ সে কিছুই নয়। Sartre বলেছেন—

> "He will not be anything until later, and then he will be what he makes of himself. Thus, there is no human nature since there is no God to conceive of it. Man is not only that which he conceives himself to be, but that which he

wills himself to be, and since he conceives of himself only after he exists, just as he wills himself to be after being thrown into existence."[৪২]

মানুষ তাই যেভাবে সে নিজেকে তৈরি করে। এটাই অস্তিত্ববাদের মূল নীতি।

অ্যাবসার্ড দর্শন ও নাটক (Absurd):

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময় ও তার পরবর্তীতে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে সমস্ত আধুনিক দর্শন-শিল্প-সাহিত্য-চিত্র-নাট্য আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল। মার্টিন এসলিন তাঁর 'The Theatre of theabsurd' গ্রন্থে বলেছেন, "As a power no use of the modern movement, Paris is an international rather than a merely French centre: it acts as a magnet attracting artists of all nationalities who are in search of freedom to work and to live."[৪৩] সামুয়েল বার্কলে বেকেট, আর্থার আদামভ, ইউজিন ইওনেস্কো, অ্যালবের কাম্যু, জাঁ পল সার্ত্র, জাঁ জেনে প্রমুখ নাট্যকাররা ইউরোপের বিভিন্ন দেশের অধিবাসী হলেও তাঁরা প্যারিসে সমবেত হয়েছিলেন নতুন জীবন দর্শনে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীনভাবে নাটক রচনার জন্য এবং নতুন সাহিত্য আন্দোলনকে রূপ দেওয়ার জন্য।

মোহিত চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'অ্যাবসার্ড নাটক' প্রবন্ধে বলেছেন, ''আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হল, বেকেট, আদামভ, ইওনেস্কো, জেনে, ক্যামু প্রমুখ রচনাকারদের জীবনদর্শন ও সৃজনশৈলীর গভীর সাদৃশ্য। অস্তিত্বের অর্থহীনতা, এবং শূন্যতা এঁদের সকলেরই মূল উপজীব্য। তাছাড়া রচনা রীতির অভিনবত্বের দিক থেকেও এঁরা ঘনিষ্ঠভাবে কাছাকাছি।''[৪৪]

এককথায় অস্তিত্বের অর্থহীনতা এবং জীবনদর্শনই হল 'অ্যাবসার্ড। 'অ্যাবসার্ডে'র জন্মের উৎস মূলত ফরাসি সাহিত্যিক-নাট্যকার অ্যালবের কাম্যু (১৯১৩-১৯৬০), জার্মানি লেখক ফ্রানৎজ কাফকা (১৮৮৩-১৯২৪), দার্শনিক সোরেন কিয়ের্কগার্দ (১৮১৩-১৯৫৬) প্রমুখদের রচনা ও জীবন দর্শন। এছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে সমস্ত পৃথিবীতে ধ্বংসের ভয়াবহতা ও কোটি কোটি মানুষের মৃত্যুর ফলে মানুষের পূর্বপরিচিত সমস্ত নৈতিক মূল্যবোধের অপমৃত্যু ঘটে। আধ্যাত্মিক নৈতিকতাও তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে। পৃথিবীব্যাপী যে যুদ্ধ, যে মৃত্যু, সেখানে ন্যায় বা অন্যায়ের পক্ষে ঈশ্বরের কোন ভূমিকা নেই। তাই ঈশ্বরের অস্তিত্বে দার্শনিকের আর কোন প্রশ্ন থাকে না। এতদিন বিজ্ঞান দাঁড়িয়েছিল নিয়মের উপরে, এই বিজ্ঞানই অনিয়মের সন্ধান দেয়। ফলে দর্শনের জগতে তার প্রভাব দেখা দেয়। দার্শনিকেরাও যুক্তিহীনতা ও কার্যকারণ সম্পর্কহীনতার কথা ঘোষণা করে। জীবনকেও তা গভীরভাবে প্রভাবিত করে। সমগ্র অস্তিত্ব যেন নড়ে ওঠে। মার্টিন এসলিন বলেছেন, " 'Absurd' originally means out of harmony, in a musical context. Hence its dictionary definition. 'out of harmony with reason or propriety; incongruous,unreasonable, illogical'. In common usage, 'absurd' may simply mean ridiculous'. ..."[৪৫]

ইউজিন আয়ানেস্কো 'অ্যাবসার্ড' সম্পর্কে বলেছেন, " 'Absurd is that which is devoid of

purpose ... cut off from his religious, metaphysical, and transcendetal roots, man is lost; all his actions become senseless, absurd useless."[৪৬]

অ্যাবসার্ড দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য হল এই ধারণাটি যে, পূর্ববর্তী যুগের অকাট্য মৌলিক অনুভূতি এবং সত্যতা সম্পূর্ণ বিদায় নিয়েছে এবং এই বলে তাদের নস্যাৎ করে দেওয়া যে পূর্ববর্তী যুগের মূল্যবোধ সস্তা এবং বাল্যকালের বিভ্রান্তি ছাড়া কিছুই না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরই মানুষের আধ্যাত্মিক অনুভূতি, ঈশ্বরে বিশ্বাস, ধর্মীয় বিশ্বাস, মূল্যবোধের প্রতি আস্থা ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এর পরিবর্তে প্রগতি, জাতীয়তাবাদ, এছাড়াও নানা আধুনিক রাষ্ট্র দর্শনের উপর মানুষ আস্থা রেখেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে এই দর্শনগুলোর প্রতি বিশ্বাসও ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। ঠিক এই সময় অ্যালবের ক্যামু তাঁর 'The Myth of Sisyphus' (1942) নামক গ্রন্থে বললেন যে, মানুষ তার জীবনের সমস্ত অর্থ হারিয়েছে। কিন্তু মানুষের অর্থহীন অস্তিত্ব থেকে মুক্তি পেতে আত্মহত্যা করা উচিত নয়।

মোহিত চট্টোপাধ্যায় অ্যাবসার্ড নাটক সম্পর্কে বলেছেন—

> ''এই পৃথিবীটার দিকে তাকিয়ে প্রায় সকলেরই মাঝে মাধ্যে নিরাশ লাগে, সভ্যতার বিকৃতি ভাবনা জাগায়— এই নষ্ট পৃথিবীতে বেঁচে থেকে কী হবে? ... অ্যাবসার্ড নাট্যকারদের কাছে অস্তিত্বের অর্থহীনতা স্থায়ী বিশ্বাস এবং তা সর্বব্যাপী। তাঁদের এই মানসিকতা চকিতে এসে আবার সরে যায় না— মস্তিষ্কে এবং হৃদয়ে শিকড় প্রোথিত করে থেকে যায়। তাই অ্যাবসার্ড নাটকের স্রষ্টাদের মনে হয়, আসলে এটা অন্ধকারের পৃথিবী, যে আলো দেখা যায় তা দৃষ্টিভ্রম ছাড়া কিছু নয়।''[৪৭]

'ব্যার্থতা, হতাশা, বিষণ্ণতা গ্রাস করলেও মানুষ একদিন তা থেকে মুক্তির আশা রাখে অন্ধকারের পৃথিবীতে থেকেই আলোর প্রত্যাশা করে। কিন্তু অ্যাবসার্ড নাটকের চরিত্ররা আশাকে মিথ্যা প্রতারণাপূর্ণ বলে মনে করে। যুক্তিহীন, অর্থহীন, লক্ষ্যহীন, সামঞ্জস্যহীন, সঙ্গতিহীন, উদ্দেশ্যহীন জীবনকেই absurd বলা হয়। অ্যাবসার্ড নাটকের চরিত্ররা কারও সাথে কারও সংস্পর্শে ও সম্পর্কে বিশ্বাস রাখে না, তাদের কোন অতীত নেই, বর্তমান নেই, ভবিষ্যতের স্বপ্ন নেই। তারা নিজেকে পৃথিবীতে 'outsider' মনে করে। তারা ভাবে পরিচিত পৃথিবী থেকে যারা নির্বাসিত হয়েছে। এই আগন্তুক চরিত্রদের সামনে তখন একটাই রাস্তা খোলা থাকে— আত্মহত্যা করা। কিন্তু আত্মহত্যা করা মানেই তো জীবনের অ্যাবসর্ডটি থেকে পালিয়ে গিয়ে বেঁচে যাওয়া। কিন্তু অ্যাবসার্ড নায়ক কখনো জীবনের ফিউটিলিটি বা নিরর্থকতা থেকে পালাতে পারে না, বরং বীরের মতো তার মুখোমুখি হয়।

এই প্রসঙ্গে অ্যালবের ক্যামু তাঁর 'The Myth of Sisyphus' গ্রন্থে গ্রীক পুরাণে বর্ণিত সিসিফাসের কাহিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন। ঈশ্বরের অবাধ্য হওয়ার জন্য তাকে চরম কিন্তু অদ্ভুত ধরনের শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। অন্তহীন ও নিরর্থক পরিশ্রমের শাস্তি স্বরূপ সিসিফাসকে একটি বিশালাকার পাথর একটি পাহাড়ে তুলতে হয়। সে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে অমানুষিক পরিশ্রম করে ঘর্মাক্ত দেহে যখন পাথরটা পাহাড়ের চূড়ায় তুলতে সক্ষম হয়, অল্প মুহূর্তের মধ্যেই সে লক্ষ করে পাথরটা তার সামনেই

গড়িয়ে পড়ে যায়। সেই সঙ্গে সিসিফাসকেও নীচে নামতে হয়। এইভাবে অনন্তকাল ধরে সিসিফাস পাথর তুলতেথাকে এবং পাথর নিচে গড়িয়ে পড়তে থাকে। জীবনযাপনের এই নিরর্থকতাই অ্যাবসার্ড নাট্যকার অ্যাবসার্ড হিসেবে তুলে ধরেন। অ্যাবসার্ড চরিত্রের জীবনও অনেকটা এইরকম— নিরর্থকতা, আশাহীনতা, লক্ষহীনতা, অন্তহীনতায় চরিত্ররা দিনযাপন করে।

অ্যাবসার্ড নাটকের বৈশিষ্ট্য:

অ্যারিস্টটল তাঁর 'Poetics' গ্রন্থে নাটকের যে সংজ্ঞা বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছিলেন, যা যুগ যুগ ধরে সমস্ত বিশ্বে নাটক রচনার মূল আদর্শ ছিল, বিংশ শতকের শুরুতে বের্টোল্ট ব্রেশ্‌টের এপিক থিয়েটার নাটক রচনার সেই অ্যারিস্টটলীয় আদর্শকে প্রথম নস্যাৎ করেছিলেন। তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে অ্যাবসার্ড থিয়েটারও অ্যারিস্টটলীয় নাট্যদৃশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীতে অবস্থান করে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুধুমাত্র পুরাতন নৈতিক মূল্যবোধ ও আদর্শ চেতনাকেই ভেঙে খান খান করে দেয়নি নাটকের প্রকরণের ক্ষেত্রেও অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটিয়েছিল।

অ্যাবসার্ড নাটক ও নাট্যকার:

ইউজিন আয়নেস্কো, স্যামুয়েল বেকেট, হ্যারল্ড পিন্টার, জ্যাঁ জেনে, অ্যাডওয়ার্ড অলবি, টম স্টপার্ড প্রমুখেরা অ্যাবসার্ড নাটকের শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা হিসেবে বিশ্ব থিয়েটারের ইতিহাসে পরিচিত। রোমানিয়ান-ফ্রেঞ্চ নাট্যকার ইউনেস্কোর 'Amede or How to get rid of it' (1954), 'The Chairs' (1952), 'The Rhinocers' (1959) প্রভৃতি এবং আইরিশ নাট্যকার Samuel Beckelt-এর 'Waiting for Godot' (1948-49), 'Endgame' (1958) প্রভৃতি সাড়া জাগানো অ্যাবসার্ড নাটক। এছাড়া ব্রিটিশ নাট্যকার হ্যারল্ড পিন্টারের 'The Birthday Party' (1957), 'The Room' (1957), 'The Dumb Waiter' (1957) ইত্যাদিও উল্লেখযোগ্য অ্যাবসার্ড নাটক।

বৈশিষ্ট্য:

i. অ্যাবসার্ড নাটকে অর্থহীন ও পুনরাবৃত্তিমূলক প্লট লক্ষ করা যায়। অ্যারিস্টটল যাকে নাটকের আত্মা বলেছেন, সেই কার্যকারণ সম্পর্ক যুক্ত প্লট অ্যাবসার্ড নাটকে নেই। যুক্তিহীন বিশৃঙ্খলাই অ্যাবসার্ড নাটকের প্লট। প্লট-বিরুদ্ধ নাটকের গঠন স্বপ্ন বা দুঃস্বপ্ন বা মুড তৈরি করতে ব্যবহার করা হয়। বিশৃঙ্খলা, অবাস্তব উপাদান ও অর্থহীনতা এবং তার সতর্ক ও শৈল্পিক ব্যবহারের মধ্যে সূক্ষ্ম রেখা রয়েছে। যদিও অ্যাবসার্ড নাটকের বাইরের স্তরটা এলোমেলো এবং অর্থহীন মনে হয়, তবু একটি অন্তর্নিহিত কাঠামো এবং অর্থটি সাধারণত নাটকের বিশৃঙ্খলার মধ্যেই পাওয়া যায়।

ii. অ্যাবসার্ড নাটকে থিম মুখ্য। মোহিত চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, ''এই থিম-কেই অ্যাবসার্ড নাট্যকার theatrically heighten করে একটা dramatic impact তৈরি করে।''[৪৮]

iii. এই নাটকে কাহিনির আদি, মধ্য, অন্তভাগ নেই কেননা অ্যাবসার্ড নাটকে কাহিনিকে বর্জন করে situation কে মুখ্য করা হয়েছে।

iv. একটি প্রচলিত নাটকে যেমন থাকে নাটকের শুরুটা এবং মধ্য অংশটা শেষের অংশের সঙ্গে

খুব ভালোভাবে যুক্ত থাকে। কিন্তু অ্যাবসার্ড নাটকে কাঠামোগতভাবে প্রচলিত নাটকের বিপরীত বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। এই নাটক উদ্ভট, অসামঞ্জস্যতায় শুরু হয় এবং শেষও হয় অযৌক্তিক উপায়ে। প্লটগুলি প্রায়শই প্রচলিত এপিসোডিক কাঠামো থেকে বিচ্যুত হয় এবং চক্রাকার মনে হয়। একইভাবে শুরু হয় এবং একইভাবে শেষ হয়। এই নাটক বর্ণনামূলক ধারাবাহিকতা এবং যুক্তির স্থিতি প্রত্যাখ্যান করে।

v. অ্যারিস্টটল নির্দেশিত 'Exposition', 'rising action', 'climax', 'denouement', 'catastrophe' অ্যাবসার্ড নাট্যকাররা বর্জন করলেন— 'They tended to use situational or cyclical structual with the ending coming full circle to the begining'. এসব নাটকে 'exposition' নেই বললেও চলে। Rising action বা development of complication বলতে এসব নাটকে যা থাকে তা illogical, nonsensical এবং কখনও Comical."[৪৯]

vi. মার্টিন এসলিনের মতে অ্যাবসার্ড হল, "The inevitable devalution of ideals, purity and purpose."[৫০] অ্যাবসার্ড নাটক দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলে, "Draw his own conclution, make his own errors" এসলিন বলেছেন, Through theatre of the absurd may be seen as nonsense. They have something to say and can be understood."[৫১]

vii. অ্যাবসার্ড চরিত্রগুলো অ্যাবসার্ড জগতে মিশে যায় এবং ভেসে বেড়ায় অনধিগম্য, অবোধ্য এক মহাবিশ্বে। বেশিরভাগ চরিত্রগুলো নিজের ইচ্ছায় নয়, যেন স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালিত হয় এবং নিয়মমাফিক শুধু কিছু পদসমষ্টি উচ্চারণ করে। অ্যাবসার্ড নাট্যকাররা চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব বা Confliction-এর শর্ত লঙ্ঘন করেন। যেহেতু চরিত্রদের কারও সঙ্গে কারও সম্পর্ক নেই, একই চরিত্রকে নানা পরিচিতি দেওয়া হচ্ছে, তাই চরিত্রদের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই।

viii. অ্যাবসার্ড নাট্যকাররা ভাষাকে যোগাযোগের উপযুক্ত মাধ্যম হিসেবে গণ্য করেন না। অ্যাবসার্ড নাট্যকাররা মনে করেন শব্দরা যথাযথভাবে মানুষের অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করতে পারে না। ভাষা যেমন প্রকাশ করতে পারে তেমনি লুকাতেও পারে— অ্যাবসার্ড স্রষ্টারা মনে করেন ''ভাষা মানুষকে আত্মগোপনের সুযোগ করে দেয়। অনেক সময় ভাষার দুটো রং— একটা ভেতরের একটা বাইরের। ভাষা গিরগিটি রং বদলায়। ভাষার চরিত্রই ভাষার উপর বিশ্বাস রাখতে দেয় না। এ কারণে ভাষাকে তাদের নাটকের সংলাপে আবোল-তাবোল, বেখাপ্পা, অসংলগ্ন, অর্থহীনভাবে ব্যবহার করে redicule করেছেন। কখনও বা mime, silence বা pause ব্যবহার করে বক্তব্যের আসল অর্থ বোঝার কৌশল নেওয়া হয়েছে— বক্তব্যের implied meaning প্রকাশের চেষ্টায়। আবার কখনও Language-এর বদলে act এনেছেন।"[৫২] নাটকের সংলাপ তাই কোন অর্থ তৈরির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় না, ভাষাকে যোগাযোগ প্রচেষ্টার নিরর্থকতা হিসেবে দেখানো হয়। এই থিয়েটারকে ইওনেস্কো বলেছিলেন 'anti theatre'।

ix. অ্যাবসার্ড থিয়েটার এমন একটি জগৎ দেখাবে যা যুক্তির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায় না। এই থিয়েটার এমন কিছু উপায় ব্যবহার করবে যা থিয়েটারের জগতে অবাস্তব বলে মনে হবে। নাটকের

যুক্তিহীন অবয়ব জীবনের অযৌক্তিক কার্যকারণ সম্পর্কহীন প্রকৃতিকে প্রতিফলিত করবে। যা বাস্তব বিরোধী। ইউনেস্কো বলেছেন, "Realism-falls short of reality, It shrinks it, ... falsify it, it does not take into account our basic truths, Truth is in our dreams, in the imagination."[৫৩] মোহিত চট্টোপাধ্যায় বলেছেন— ''মানুষের অন্তর্জগতই তার সঠিক পরিচয়- সেখানে লুকোচাপা নেই, আত্মপ্রতারণা নেই, এখানেই তার স্বচ্ছতম চরিত্র। মানুষকে subjectively দেখতে চাইলেই তার অন্তর্জগতের এই স্বচ্ছতাকে উন্মোচন করা যায়। এবং এ কাজে realism ব্যর্থ।"[৫৪] শূন্যতা, 'nothing-ness', অনুপস্থিতি, রহস্য, অমীমাংসিত রহস্য এই থিয়েটারের কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য।

x. অ্যারিস্টটল 'Poetics'-এ যে স্থান, কাল ও ক্রিয়ার ঐক্যের কথা বলেছেন, তা অ্যাবসার্ডিস্ট নাট্যকাররা নস্যাৎ করে দিয়েছেন চরিত্রদের আত্মিক জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য। নাটকের পরিবেশে দুঃস্বপ্ন বা স্বপ্নের মতো এফেক্ট তৈরি করা হয়। যেখানে নায়ক চরিত্র পরিবেশের বিশৃঙ্খল বা অযৌক্তিক প্রকৃতির দ্বারা অভিভূত হয়। বাস্তব জগতে স্বপ্নের জগতে বিচরণ করা চরিত্রদের উচ্চারিত ভাষা একটি নির্দিষ্ট ধনাত্মক, ছন্দবন্ধ প্রায় বাদ্যযন্ত্রের গুণ অর্জন করে।

xi. ঐতিহ্যবাহী থিয়েটার যেখানে জীবনের ফটোগ্রাফিক চিত্র তুলে ধরতে চায়, সেখানে অ্যাবসার্ড নাটক স্বপ্নের জগৎ তৈরির চেষ্টায় থাকে। আর এই স্বপ্নের কেন্দ্রীয় বিন্দুটি মানুষের মৌলিক বিভ্রান্তি ও বিহ্বলতার মধ্যে থাকে। অ্যাবসার্ড নায়ক বা নায়িকা এমন কিছু প্রশ্ন করে— যে প্রশ্নগুলোর কোন উত্তর নেই। যেমন, কেন আমরা বাঁচি? কেন আমাদের মরতে হবে? পৃথিবীতে এত অন্যায় অত্যাচার কেন? কেন মানুষের জীবনে এত কষ্ট ও যন্ত্রণা?

xii. বেশিরভাগ অ্যাবসার্ডিস্ট নাট্যকার অ্যাবসার্ড নাটকে অ্যাবসার্ড এবং ট্রাজেডিকে এমনভাবে মিশিয়ে দেন, যেখানে ভয়ঙ্কর ট্রাজেডি কখনো হাস্যকর কখনো বা মর্মান্তিক পরিণতি লক্ষ করা যায়। কিন্তু ট্রাজেডির পরিণতি অ্যারিস্টটলের Catharsis অনুসরণে দর্শকদের ভাবমোক্ষণ ঘটে না বা আনন্দ দান করে না— ''বরং একটা শ্বাসরুদ্ধ, অসহায়, কম্পমান আতঙ্কের পরিবেশে স্থানু করে রাখে। Absurd নাটকের সমাপ্তি নেই, কারণ যে শূন্যতার মধ্যে এ নাটকের চরিত্রগুলি আবদ্ধ তারা এই অবস্থার কোনরকম সমাপ্তিতে পৌঁছতে পারে না। অর্থহীনতাকে বয়ে চলাতেই এর ট্রাজেডি।"[৫৫]

xiii. অ্যাবসার্ড থিয়েটারের অভিনেতা সম্পর্কে বলা হয় তিন ঘণ্টার মধ্যে তাকে মঞ্চের মধ্যে দর্শকদের সামনে অভিজ্ঞতা এবং সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী জীবন প্রকাশ করতে হবে। একে বলা হয়, নিজেকে খুঁজে পেতে নিজেকে হারানো। অ্যাবসার্ড অভিনেতা-অভিনেত্রী মঞ্চের মধ্যে নাটক চলাকালীন তিন ঘণ্টা সময় ধরে মৃত প্রান্তের সমগ্র পথটি দর্শকদের সামনে পরিক্রমা করে, যা দর্শকদের সম্পূর্ণ করতে সমগ্র জীবন লেগে যায়। অ্যালবের ক্যামু বলেছেন—

> "This is where the actor contradicts himself; the same and yet so various so many souls summed up in a single body. Yet it is the absurd contradiction itself, that individual who wants to achieve everything and live everything,

that useless attempt, that ineffectual persistence. what always contradicts itself neverthelss joins in him."[৫৬]

ম্যাজিক রিয়ালিজম (Magic Realism):

'MAGICAL REALISM Theory, History, Community' গ্রন্থে বলা হয়েছে—

"Writing in German in 1925 to champion a new direction in painting, Franz Roh originates the term Magic Realism to characterize this new paintings return to Realism after Expressionism's more abstract style. With the term, Roh Praises Post-expressionsm's realistic, figural representation, a critical move that contrasts with our contemporary use of the term to signal the contrary tendency, that is, a text's departure from realism rather than its reangagement of it."[৫৭]

রিয়ালিজম এবং ম্যাজিক রিয়ালিজম জীবনকে বর্ণনা করেছে রোমান্টিক আত্মচেতনার আদর্শায়ন না করেই। ম্যাজিক রিয়ালিজম শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন Franz Roh (1925)। কিন্তু ম্যাজিক রিয়ালিস্ট দর্শন সর্বপ্রথম প্রয়োগ হয়েছিল Garcia Marquez's-এর 'One hundred years of solitude' উপন্যাসে ১৯৬৭ খ্রী:। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে যাদুবাস্তবতা চিত্রশিল্পেও প্রতিফলিত হয়। তারপরে এটি উত্তর আমেরিকায় পরাবাস্তবতার মোড়কে সাহিত্যে-শিল্পে দেখা দেয়।

ম্যাজিক রিয়্যালিস্ট আন্দোলন শুরু হয়েছিল এক্সপ্রেশনিজম, কিউবিজম প্রভৃতি দর্শনের প্রতিক্রিয়ায়। ম্যাজিক রিয়ালিজম হল, বাস্তব এবং ফ্যানটাসির পাশাপাশি অবস্থান এবং মিশ্রণ; দক্ষতার সঙ্গে সময়ের পরিবর্তন, জটিল, বিভ্রান্তিকর আখ্যায়িকা ও প্লট, যেখানে স্বপ্নের বহুবিধ ব্যবহার, মিথ, রূপকথার গল্পের শৈলী, অধিবাস্তবিক বিবরণ, রহস্যময় জ্ঞান, আকস্মিকতার অভিঘাত রয়েছে যা ভয়ঙ্কর এবং ব্যাখ্যাতীত।

যাদুবাস্তবতা হল এমন একটি নন্দন তাত্ত্বিক শৈলী যেখানে যাদুবাস্তবতার উপাদান এবং বাস্তব পরিমণ্ডল মিশ্রিত হয়েছে গভীর বাস্তবকে বোঝার জন্য বা ছোঁয়ার জন্য। এখানে যাদুবিদ্যার উপাদান স্বাভাবিক ঘটনার মতো করে উপস্থাপন করা হয়েছে যাতে বাস্তব এবং ফ্যানটাসি সহজভাবে একই সঙ্গে আমরা গ্রহণ করতে পারি। রিয়ালিজম এবং ম্যাজিক রিয়ালিজমের পার্থক্য করতে গিয়ে বলা হয়েছে। ম্যাজিক রিয়ালিজম হল—

"Relies upon the presentation of real, imagined or magical elements as it they were real (It furthermore) relies upon realism but only so that it can stretch what is acceptable as real to its limits'. As a simple point of comparision, Roh's differentiation between expressionism and post-expres-

sionism as described in German Art in the 20th century, may be applied to Magic Realism and realism. Realism pertains to the terms 'history', 'mimetic', 'familiarization', 'empiricism/logic', 'naration', 'closure-ridden/redutive naturalism', and 'rationalization/cause and effect." on the other hand, Magic realism encompasses the terms 'myth/legend", 'fantastic/supplementation', 'defamiliarization', 'mysticism/magic', 'meta-narration', 'open-ended/expansive romanticism', and 'imagination/negative capability."[৫৮]

ম্যাজিক রিয়ালিজমকে 'marvelous real' ও বলা হয়। মার্ভেলাস সুন্দর অর্থেই শুধু নয়। কদর্য, কুৎসিত, বিকৃতি এবং সমস্ত ভয়ঙ্কর ও অদ্ভুত বিষয়ই মার্ভেলাস। ম্যাজিক রিয়ালিস্ট তাত্ত্বিকরা এর সংজ্ঞায় বলেছেন—

"Magic Realism– the capacity to enrich our idea of what is 'real' by incorporating all dimensions of the imagination, particularly as expressed in magic, myth and religion."[৫৯]

ম্যাজিক রিয়ালিজম ও ফ্যান্টাসি:

ফ্যান্টাসি এবং যাদুবাস্তবতা এক নয়। তাদের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। ফ্যান্টাসিতে নতুন জগৎ সৃষ্টি করে সম্ভবত নতুন গ্রহ। কিন্তু এর বিপরীতে যাদুবাস্তবতার লেখক নতুন জগৎ সৃষ্টি করেন না। এমনভাবে ফ্যান্টাসি তৈরি করেন যাতে মনে হয় যে আমাদের বাস্তব পৃথিবীতে যাদু রয়েছে। ফ্যান্টাসি দেখার পর বা পড়ার পর দর্শকের মনে সন্দেহ, ভ্রম ও ইতস্ততার জন্ম হয়। প্রাকৃতিক ও অতিপ্রাকৃত, বিশ্বাস ও অবিশ্বাস, রহস্য ও অদ্ভুতের মধ্যে দ্বিধা দ্বন্দ্ব দেখা দেয় ফ্যান্টাসির জগতে চরিত্রদের মধ্যে। অন্যদিকে ম্যাজিক রিয়ালিজমে এই দ্বন্দ্ব, সন্দেহ, ভ্রম দেখা দেয় না। একই ভূতুড়ে পরিবেশ ম্যাজিক রিয়ালিজমে বাস্তব, অকল্পনীয় ও স্বাভাবিক মনে হয়।

ম্যাজিক রিয়ালিজম ও সুররিয়ালিজম:

যাদুবাস্তবতা ও পরাবাস্তবতা উভয়েই বাস্তব এবং ফ্যান্টাসির মিশ্রণে সৃষ্ট। ম্যাজিক রিয়ালিজম অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে, রহস্যময় উপায়ে স্বাভাবিকের মতো করে অবাস্তবতা উপস্থাপন করে। যা বাস্তবে ঘটতে পারে কিন্তু ঘটার সম্ভাবনা নেই। অন্যদিকে পরাবাস্তবতা আমাদের এমন অবাস্তব জগতে নিয়ে যায় যার অস্তিত্ব শুধুমাত্র আমাদের অবচেতন মনেই আছে। অবচেতন মন নিয়েই পরাবাস্তববাদীদের কারবার। তারা অসম্ভবকে প্রয়োগ করেন ঐতিহ্যবাহী এবং অভিজ্ঞতালব্ধ শৈল্পিক উপায়ে— যেটা অনেকসময় আমাদেরকে বিস্মিত করে, বেদনা দেয়।

দ্বিতীয় পর্ব: মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্বের নাটকে রাজনৈতিক সচেতনতা লক্ষ করা যায়। উৎপল দত্তের মতো তিনি নিজেকে প্রোপাগান্ডিস্ট বলতেন না। তিনি রাজনীতির কথা, সমাজের কথা অনেকটা সূক্ষ্মভাবে বলেছেন। এই পর্বের নাটকে রাজনীতি এসেছে অভিনব উপায়ে, কখনো

ফ্যান্টাসি কখনো ম্যাজিক রিয়ালিজমের মতো করে তার প্রকাশ ঘটেছে— যা বাংলা নাটকে আগে কখনো দেখা যায়নি। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন, নাটকের জগতে প্রবেশ করার মুহূর্তে তিনি যে নাটকগুলি লিখেছেন, যেমন, 'কণ্ঠনালীতে সূর্য', 'মৃত্যুসংবাদ', 'নীলরঙের ঘোড়া', 'গন্ধরাজের হাততালি', 'চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড'— এই নাটকগুলি ছিল, 'Away from politics' এই কারণে অনেকেই তাঁর সমালোচনা করেছেন। তার কারণ সেই সময়টা ছিল ষাট ও সত্তরের দশক, চারিদিকে আন্দোলন, ধর্মঘট, বিক্ষোভ, মিছিল, দমনপীড়ন, অত্যাচার, রক্তপাত সমাজ ও রাষ্ট্রে ভয়ঙ্কর রাজনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টি করেছিল। অথচ তাঁর সেই সময়ের নাটকে যেন সেগুলি ফুটে উঠছিল না। অভিযোগ আসছিল, ''... তোমার নাটকগুলো কি বাপু? এতো সময়ের সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি নেই, একি উদ্ভট জিনিসটি করছো, দ্যাখো একটু, সজাগ হও, সচেতন হও।''[৬০] মোহিত চট্টোপাধ্যায় নিজে বলেছিলেন, ''এগুলোর মধ্যে যেন ঐ জগৎটা নেই, অর্থাৎ চারপাশে চলেছে একটা উত্তাল ভয়াবহ পরিস্থিতি। রাজনৈতিক আবর্তের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ছে। এগুলো তখন অল্পবিস্তর সব মানুষের শরীরে এসে পড়ছে, মনে এসে পড়ছে। তাদের কাজের মধ্যে তার নিশ্চয়ই প্রতিক্রিয়া থাকবে। কিন্তু আমি একটি নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান, অনেক বঞ্চনার মধ্যে আছি, আমার অনেক ক্ষোভ, অনেক বিক্ষোভ, রাজনৈতিক দিক থেকে, সামাজিক দিক থেকে, উপার্জনের দিক থেকে, যতটুকু যোগ্যতা তার তুলনায় কী যৎসামান্য, কী নিগৃহীত জীবনযাপন করতে হচ্ছে, the system is very bad, কাজেই মনের ভিতরে সেই একটা ক্ষোভ, বিক্ষোভের জায়গা রয়েছে। সেই মানুষটা খুব শান্তভাবে নাটকগুলো লিখছে, অস্বাভাবিক মনে হয়।''[৬১]

এরপরে তিনি ধীরে ধীরে তৈরি হচ্ছিলেন রাজনৈতিক নাটক লেখার জন্য সিস্টেমের বিরুদ্ধে, প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে, শাসকের অন্যায় অত্যাচার শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানোর জন্য তিনি নতুন ভাষা, নতুন ভঙ্গির আশ্রয় নিলেন তার 'রাজরক্ত' (১৯৭০) নাটকে। রাজরক্তের বিষয় পুরাতন, চরিত্র পুরাতন, রাজনীতিটাও পুরাতন, কিন্তু উপস্থাপন ভঙ্গিটা ছিল সম্পূর্ণ অভিনব। বাংলা রাজনৈতিক নাটকের ইতিহাসে 'রাজরক্ত' একটা নতুন যুগের সূচনা। তিনি বলেছিলেন, ''রাজরক্ত' লেখবার জন্য অপেক্ষা করছি ভেতরে ভেতরে। যে 'রাজরক্ত'র মধ্যে একটা প্রখরভাবে রাজনৈতিক জগৎ আছে, রাজনৈতিকভাবে নিজেকে নাটকের মধ্যে যুক্ত করার জায়গা আছে এবং তোমরা জানো নাটকটা সেই সময় বিভিন্নভাবে প্রশাসন এবং বিভিন্ন ভারতীয় প্রশাসনের যে কোনো জায়গায় তাকে ব্যতিব্যস্ত করেছে। এখানেও ঐ নাটককে অনেক বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তে হয়েছে। ভূপালে সেটাকে Band করে দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরায় Band করে দেওয়া হয়েছে। এখানে কোনো কোনো দল করতে ভয় পেত। থিয়েটার ওয়ার্কশপ অদম্য মানসিক শক্তি নিয়ে সেই নাটকটি করেছে।''[৬২]

এখানে রাজনৈতিক সচেতনতা, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ নাট্যকারের নিজস্ব স্টাইলে প্রকাশিত হয়েছে। নাগরিক বুদ্ধির ঝলকও আছে এই পর্বে। মানবিক অনুভূতি, সমাজ, রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা এবং সেই সমস্যার মধ্যে পড়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের প্রেম, বিবাহ, জীবন, জীবিকা, বেকারত্ব, প্রভৃতি জীবনের নানা দিক ব্যাপ্ত করে তিনি নাটক লিখেছেন এই পর্বে।

তথ্যসূত্র:

১. বিমোহিত কথকতা। শ্যামল ঘোষ। মাঘ ১৪১৯। জানুয়ারি ২০১৩। আজকাল পাবলিশার্স প্রা:লি:। কলকাতা। পৃ. ২৫।

২. ঐ। পৃ. ২৬।

৩. ঐ। পৃ. ২৭।

৪. নাটকের নানা রং। বাসবী রায়, শুভ্র মজুমদার। প্রথম প্রকাশ ১৯ জুলাই, ২০১১। প্রকাশক: নাট্যশোধ সংস্থান। কলকাতা। পৃ. ১১৬

৫. ঐ। পৃ. ১২৫

৬. ঐ। পৃ. ১২৬

৭. হৃদয়ের থেকে ভালো বাসভূমি নেই, কমল সাহা। প্রথম প্রকাশ ৩১ মে, ২০০৯। রঙ্গপট বাংলা নাট্যকোষ পরিষদ। কলকাতা। পৃ. ১১১

৮. প্রমা-মোহিত চট্টোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা ২০১৩। সম্পাদক শুভঙ্কর রায়। পৃ. ৯

৯. ঐ। পৃ. ১০

১০. অনুষ্টুপ সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক। ৩৮ তম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ১৪১১। কলকাতা। সম্পাদক অনিল ভট্টাচার্য। পৃ. ১০৩

১১. হৃদয়ের থেকে ভালো বাসভূমি নেই। কমল সাহা। পৃ. ১৪১

১২. ঐ। পৃ. ১৪১

১৩. অনুষ্টুপ সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক। ৩৮ তম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ১৪১১। কলকাতা। সম্পাদক অনিল ভট্টাচার্য। পৃ. ১০৪

১৪. রঙ্গপট নাট্যপত্র ২০১২। সম্পাদক ডা: তপনজ্যোতি দাস। কলকাতা। পৃ. ৮৪

১৫. ঐ। পৃ. ৮৪

১৬. কবিতা সংগ্রহ মোহিত চট্টোপাধ্যায়। প্রথম প্রকাশ ২৯ ভাদ্র, ১৪০০। পুস্তক বিপণি। কলকাতা। পৃ. ৪৭

১৭. ঐ। পৃ. ১৪৭

১৮. ঐ। পৃ. ৩৬

১৯. ঐ। পৃ. ১৬৪

২০. হৃদয়ের থেকে ভালো বাসভূমি নেই। কমল সাহা। পৃ. ৩১

২১. ঐ। পৃ. ৩১

২২. ঋতবীণা। মোহিত চট্টোপাধ্যায় স্মরণ সংখ্যা। নবম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১৩। মুর্শিদাবাদ। সম্পাদনা রীণা কংসবণিক। পৃ. ৩৯

২৩. মোহিত চট্টোপাধ্যায়। রঙ্গপট নাট্যপত্র ২০১২। সম্পাদক ডা: তপনজ্যোতি দাস। কলকাতা। পৃ.

৮১
২৪. মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ। প্রথম প্রকাশ বইমেলা, জানুয়ারি ২০০৬। নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন। কলকাতা। পৃ. ১০
২৫. ঐ। পৃ. ১১
২৬. ঐ। পৃ. ১২
২৭. ঐ। পৃ. ১৩
২৮. ঐ। পৃ. ১১
২৯. নাট্যকলায় বিভিন্ন ইজম ও এপিক থিয়েটার। জিয়া হালদার। বাংলা একাডেমি ঢাকা। প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৪০২। পৃ. ১১
৩০. ঐ। পৃ. ১১
৩১. মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ। প্রথম প্রকাশ বইমেলা, জানুয়ারি ২০০৬। নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন। কলকাতা। পৃ. ১১
৩২. DADA AND SURREALISM A very Short Introduction। David Hopkins। OXFORD। First Published 2004। New York। Page-Introduction.
৩৩. নাট্যকলায় বিভিন্ন ইজম ও এপিক থিয়েটার। জিয়া হালদার। পৃ. ৪৮
৩৪. ঐ। পৃ. ৪৯
৩৫. ঐ। পৃ. ৫৩
৩৬. ঐ। পৃ. ৫৫
৩৭. J.L. Styan /'Modern Drama in Theory and Practice (3)/Exprissionism and Epic Theatre/page-5/ Cambridge University Press/UK/2000.
৩৮. অস্তিত্ববাদ দর্শনে ও সাহিত্যে। সম্পাদনা সঞ্জীব ঘোষ। রত্নাবলী। প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৯৩৩। সেপ্টেম্বর ১৯৮৬। পৃ. ২০
৩৯. ঐ। পৃ. ২
৪০. Existentialism is a humanism/JEAN PAUL SARTRE/ First published 2007/YALE UNIVERSITY PRESS/ NEW HAVEN & London/Page-22
৪১. ঐ। পৃ. ২২
৪২. ঐ। পৃ. ২২
৪৩. The Theatre of the Absurd/ MARTIN ESSLIN/ First Published 1961/Methuen Drama/ Landon/Page-26
৪৪. মোহিত চট্টোপাধ্যায়। নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ। নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন।
৪৫. The Theatre of the Absurd/ Martin Esslin/ Page 23

৪৬. ঐ। পৃ. ২৩

৪৭. মোহিত চট্টোপাধ্যায়। নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ। পৃ. ৩৪

৪৮. মোহিত চট্টোপাধ্যায়। নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ। নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন। পৃ. ৪৩

৪৯. ঐ। পৃ. ৪৩

৫০. The Theatre of the Absurd/ MARTIN ESSLIN/ First Published 1961/Methuen Drama/ Landon/Page-24

৫১. ঐ। পৃ. ২০

৫২. ঐ। পৃ. ২১

৫৩. মোহিত চট্টোপাধ্যায়। নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ। নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন। পৃ. ৪৪

৫৪. ঐ। পৃ. ৪৫

৫৫. ঐ। পৃ. ৪৩

৫৬. The Myth of Sisyphus and other essays/ Albert Camus/First Published 1955/Vintage International/United States of America/Page-42

৫৭. Magical Realism Theory, History, Community/ LOIS PARKINSON ZAMORA AND WENDY B. FARIS, EDITORS/DUKE UNIVERSITY PRESS/Durham & London/1995/ Page-15

৫৮. Sodhganga. Inflibnet.ac.in/Page-7

৫৯. ঐ। পৃ. ১১

৬০. ঋতবীণা। মোহিত চট্টোপাধ্যায় স্মরণসংখ্যা। সম্পাদনা রীণা কংসবণিক। পৃ. ৮৬

৬১. ঐ। পৃ. ৮৫

৬২. ঐ। পৃ. ৮৬